আল্লাহর পথের ঠিকানা

[উর্দূ ভাষণের সংকলন– 'তা'মীরে ইনসানিয়াত' এর অনুবাদ]

মূল উর্দূ ভাষণ

আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

[বর্তমান দুনিয়ার অন্যতম প্রধান আলেমে দ্বীন, দার্শনিক, সাহিত্যিক,
বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়ীতা, ইতিহাস বিশ্লেষক এবং দা-ঈ]

অনুবাদ

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ

উস্তায, জামিআ দারুল উলূম, মতিঝিল, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

আল্লাহর পথের ঠিকানা

[উর্দূ ভাষণের সংকলন– 'তা'মীরে ইনসানিয়াত' এর অনুবাদ]

মূল উর্দূ ভাষণ
আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ
মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ

প্রকাশকাল
জুন ১৯৯৯ ঈসায়ী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রাহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৩/৬, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩৪৮৭৭

বর্ণ বিন্যাস
সাইফুল ইসলাম
আশ্ শামস কম্পিউটার
১৪ নং মদন পাল লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

মুদ্রণ
মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৪নং আর, এম, দাশ রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

হযরত ক্বারী সিদ্দীকুর রহমান [রহ.]

এক নিভৃত সাধক;
জীবনে যিনি বহু জীবন
নির্মাণ করে গেছেন

আল্লাহ্ তাঁকে মাগফিরাত, রহমত ও
দারাজাতের বুলন্দি দান করুন।।

– অনুবাদক
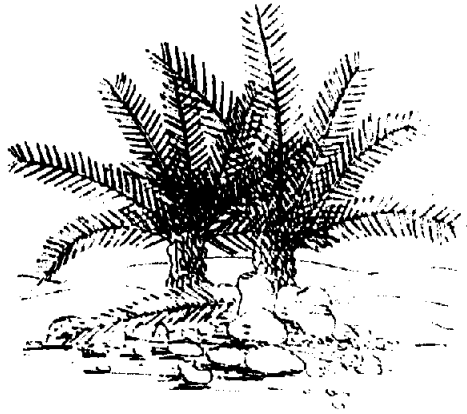
আল্লাহর পথের ঠিকানা

মূলঃ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুঃ মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ

অনুবাদকের বিনীত আরয

আল্লাহর পথে মানুষকে আহবানের শাশ্বত ধারায় বর্তমান সংকটগ্রস্থ ও ফিৎনা আক্রান্ত সময়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, সাহিত্যিক, ইতিহাস বিশ্লেষক আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর ভূমিকা প্রায় গোটা পৃথিবী জুড়েই স্বীকৃত। ছোট খাটো মুসলিম সংখ্যালঘু দেশ থেকে নিয়ে, ইউরোপ-আমেরিকা এবং ইসলামী সভ্যতার পিঠস্থান মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত তাঁর কথা, কলম ও কদমের চিহ্ন বিদ্যমান। একজন প্রবল শক্তিধর সাহিত্যিক, ইতিহাস বিশ্লেষক ও দার্শনিক পরিচয়ের পাশাপাশি নিতান্ত সাদাসিধে জীবন যাপনকারী আল্লাহওয়ালা ও আকাবির-বুযুর্গগণের সান্নিধ্য ধন্য এই মনীষীর দাওয়াতের ভঙ্গিটি চূড়ান্তভাবেই ব্যাপক ও ইতিবাচক। ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে মানুষের হৃদয়ের কোমলতা ও কৌতূহলের নরম যমীনে আত্মজিজ্ঞাসা ও গন্তব্যের প্রশ্নটিকেই তিনি মমতার সাথে বপণ করে যান। বুদ্ধিবৃত্তিক সমৃদ্ধি ও সমকালীন সচেতনতা পুষ্ট তাঁর দা'ওয়াতী মিশন তাই ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

প্রধানত সাহিত্যকে দা'ওয়াতের বাহন হিসেবে গ্রহণ করলেও বিভিন্ন মজলিস, সেমিনারে বক্তব্য, ভাষণ ও খোলামুখের আহবানে তিনি যেসব হিরক মূল্যের আলোচনা উপস্থাপন করেন, সেগুলির সংকলনও অত্যন্ত উঁচু মাপের ব্যতিক্রমী সাহিত্যরূপে পরিচিতি লাভ করেছে। 'আল্লাহর পথের ঠিকানা'–এর মূল গ্রন্থ 'তা'মীরে ইনসানিয়াত' তেমনি একটি গ্রন্থ। লেখক পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একটি দা'ওয়াতী মিশন নিয়ে সফর করেছিলেন।

তৎকালীন দুনিয়ার জটিলতা ও বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয় উজাড় করা যেসব ভাষণ তিনি প্রদান করেন, ব্যাপকতা, গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতার দিক থেকে সেই ভাষণগুলি এক একটি কালজয়ী আহবান হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার দাবী রাখে। নিজের যোগ্যতার প্রশ্নে বিব্রত ও বিড়ম্বিত বোধ করলেও দীন অনুবাদকের সেই ভাষণের সংকলনটি বাংলায় অনুবাদ করার লোভ আর সংবরণ করা সম্ভব হয়নি। দুঃসাহস ও আবেগের কাছে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে অবশেষে অনুবাদ কর্ম শুরু হয় এবং এভাবেই 'আল্লাহর পথের ঠিকানা'র আত্মপ্রকাশ ঘটে।

অনূদিত কপিটি প্রকাশের জন্য বিপুল হৃদ্যতা নিয়ে এগিয়ে আসেন সুহৃদ বন্ধু মাওলানা হাবীবুর রহমান খান; তাকে আন্তরিক মুবারকবাদ ও শুকরিয়া। আগ্রহ ও দরদ নিয়ে কপিটি প্রায় আগাগোড়া পড়েন ও কিছু পরিমার্জনা করেন আরেকজন হৃদয়বান মানুষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে আরো যারা শ্রম ও ত্যাগ দিয়েছেন, তাদেরকেও শুকরিয়া জানাই।

সম্মানিত পাঠক! এটি আমার প্রথম অনূদিত বই। আপনার আগ্রহী চোখ যেসব স্থানে হোচট্ খাবে– তার জন্য আমি আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং অবশ্য-পরিবর্তনীয় কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা অনুবাদকের গোচরে আনার জন্য অনুরোধ কবছি। আল্লাহই একমাত্র তাওফীক দাতা এবং সমস্ত প্রশংসার মালিক তিনিই। সবশেষে দুআ'র দরখাস্ত করছি সবার কাছে।

শরীফ মুহাম্মদ

২৪/৬/৯৯

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

অবক্ষয়ের শিকড়ঃ

পাপের চাহিদা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে

[ভাষণটি লক্ষ্ণৌ শহরের গঙ্গ প্রসাদ মেমরিয়াল হলে ১৯৫৪ ইং সনের ৯ জানুয়ারী প্রদত্ত হয়। শহরের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ সহ হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিত মহলের একটি মিশ্র সভা ভাষণটির শ্রোতা ছিলেন]

ইতিহাস পাঠ

আপনাদের অধিকাংশই ইতিহাস পাঠ করে থাকবেন। মানুষ আজকের নতুন কোন প্রাণী নয়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের বিচরণ রয়েছে। তার কোটি বছরের ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে। সে ইতিহাসের প্রবাহ পানির প্রবাহের মত সমান্তরাল নয়। তাতে রয়েছে ভীষণ উত্থান-পতন। সেই ইতিহাসের কোথাও মানুষকে উচ্চশ্রেণীর প্রাণীরূপে দেখা যায়, কোথাও সে অতি নীচু। কখনো মনে হয়, এ তো মানুষের ইতিহাস নয়, এ যেন রক্তচোষা, হিংস্র জন্তুর ইতিহাস। মনে হয়, এ–ইতিহাস যার-তার, সকলের হতে পারে, কিন্তু মানুষের নয়। এ ইতিহাস-অধ্যয়নে মানুষের মাথা নত হয়ে আসে; আমাদের মাঝে এমন সব মানুষও অতিক্রান্ত হয়েছে! আপনারা এবং আমরা কেমন মানুষ, এ সিদ্ধান্ত তো নিবে অনাগত প্রজন্মের লোকেরা। কিন্তু এ অনুমান আমরা করতে পারি যে, মানুষের অতীতের রেকর্ড কেমন ছিলো। সেসবের মাঝে এমন কিছু সময় ও পর্বও পরিলক্ষিত হয় যে, যদি সম্ভব হতো তাহলে ইতিহাস থেকে আমরা সে সব পৃষ্ঠাগুলো উপড়ে ফেলতাম। সেগুলো এমন রেকর্ড যে, আমরা শিশুদের হাতেও তা তুলে দিতে প্রস্তুত নই। আমার দায়িত্ব সেই ক্রান্তিকালের কাহিনী শোনানো নয়, বরং ইতিহাসে এরকম যে সব অনাকাঙ্খিত পর্ব অতিক্রান্ত হয়েছে, তার মাঝে যাবতীয় অমঙ্গল ও অবক্ষয়ের শিকড় কি ছিলো সেই অমোঘ বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ।

সমাজ ও সংস্কৃতির পচন

সাধারণত কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী অথবা কতিপয় ব্যক্তি এবং কখনো একা এক ব্যক্তিকেই সম্পূর্ণ সমাজ ও সোসাইটির অবক্ষয়ের জন্য মানুষ দায়ী করে থাকে। মানুষ মনে করে, এই অসাধু গোষ্ঠী কিংবা এই বিভ্রান্ত ব্যক্তি জীবনের গতিকে এক ত্রুটিপূর্ণ লক্ষ্যে প্রবাহিত করে দিয়েছিলো। কিন্তু এই ধারণার সাথে আমি একমত পোষণ করতে পারছি না। ইতিহাস অধ্যয়নের উপর ভিত্তি করে আমি বলছি, একটি নষ্ট মাছ সম্পূর্ণ পুকুর পচিয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু একজন মানুষ সমগ্র সোসাইটির অবক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে না। বাস্তবতা হচ্ছে, ভালো সোসাইটিতে মন্দলোকের অবকাশ থাকতে পারে না। সেখানে তার নিষ্কৃতি সম্ভব হয় না। হা-হুতাশ করে সে মারা যায়। তেমনি যে সমাজ ও সংস্কৃতি মন্দের উৎসাহ যোগায় না, সে সেই মন্দ লোকটিকেও স্বাগত (WELCOME) জানাতে প্রস্তুত থাকে না। অসততা ও অবক্ষয় সেখানে তড়পাতে থাকে। তার শ্বাস ফুরিয়ে যেতে থাকে এবং একসময় সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

প্রতিটি যুগেই ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ মানুষ ছিলো। কিন্তু সকল মন্দের জন্য মন্দ লোকদের দায়ী করা এবং সকল মন্দ কর্মের দায় তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া অনুচিত। কিছু মন্দ লোকের প্রকাশ হলেও এর অর্থ এরূপ করা যায় না যে, সম্পূর্ণ জীবনাচারের লাগাম তাদের হাতেই ছিলো, তারা যেভাবে ইচ্ছা জীবন ও যিন্দেগীর গতি সেভাবেই ঘুরিয়ে দিতো; বরং বিষয়টি হলো, খোদ সে সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির মাঝেই অবক্ষয় এসে গিয়েছিলো। সেকালের আত্মা (CONSCIENCE) পঁচে গিয়েছিলো। তার ভিতরে অন্ধকার ও অত্যাচার বেড়ে গিয়েছিলো। রিপুর তাড়না পূরণের প্রবৃত্তি চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলো মারাত্মকভাবে, স্বার্থবাদী ও আত্মপূজারী হয়ে গিয়েছিলো সমাজ। যে হৃদয়ে পচন ধরে যায়, যে মন পাপী হয়ে উঠে, অপরাধ থেকে তাকে আপনি কোনভাবেই ফিরাতে পারবেন না। আপনি তাকে বেড়ী দিয়ে আটকিয়ে রাখলেও পাপাচার থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন না।

স্বার্থপর মানুষ

প্রতি যুগেই এমন কিছু মানুষ ছিলো যারা বিশ্বাস করতো, শুধু আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজনই মানুষ আর অন্যসব মানুষ হলো আমাদের চাকর-বাকর। এমন কিছু মানুষও আছে, যারা কোটি মানুষকে বেঁচে থাকতে দেখে বটে, কিন্তু নিজেদের সীমাবদ্ধ একটি গোষ্ঠীকেই শুধু মানুষ মনে করে।

মনে করে, সমগ্র পৃথিবীতে শুধু তাদের পরিবারের দশ-এগার কিংবা বিশ-পচিশজন মাত্র প্রকৃত-মানুষ বসবাস করে।

সর্বকালেই এমন কিছু মানুষের সন্ধান মিলে, যারা নিজের সমস্যা এবং নিজের আত্মীয়-স্বজন ও সংশ্লিষ্টদের দেখার ব্যাপারে অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টির অধিকারী হয়। অন্যদের দেখার বিষয়ে তাদের চোখ বুঁজে আসে। কেউ কেউ আবার দু'রকম চোখের অধিকারী হয়। এক চোখে তারা নিজেদের দেখে।' অন্যচোখে দেখে সমস্ত পৃথিবীটাকে। এদের কারুরই কোথাও মানুষ চোখে পড়ে না। আমার ধারণা, এদের কাছে সেই চোখই রয়েছে, যে চোখে এরা আপন শিশুকে আকাশের সাথে গল্প করতে দেখে, নিজের সামান্য তুচ্ছ জিনিসকে এরা পর্বত মনে করে আর অন্যের পাহাড়কেও মনে করে বিন্দু।

সংশোধনের বিচিত্র প্রস্তাব এবং অভিজ্ঞতা

দুনিয়ার বিভিন্ন মানুষ যার–যার ধারণা ও উপলব্ধি অনুযায়ী জীবন-শুদ্ধির পন্থা চিন্তা করেছে এবং তা কার্যকর করা শুরু করেছে।

কেউ বলেছে, সকল অবক্ষয় ও মন্দের মূল হচ্ছে মানুষের অভাব। পেট ভরে মানুষ খাবার খেতে পারছে না, এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যধি। তারা এই বিষয়টিকে নিজেদের মিশন বানিয়ে নিয়েছে। ফলে পাপ আরো বেড়েছে। প্রথমে মানুষ দুর্বল ছিলো। পাপও সে তুলনায় ছিলো কমযোর। তারা যখন রক্তের ইঞ্জেকশন পুশ করেছে এবং জীবনীশক্তি (VITALITY) বৃদ্ধি করেছে, তখন তাদের পাপও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। হৃদয় বদলায়নি, আত্মা বদলায়নি, বদলায়নি চেতনা। কিন্তু শক্তি বেড়ে গেছে, চেতনাহীনতা জন্ম নিয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, পূর্বে ছেঁড়া পোশাকে পাপ হতো, এখন উজ্জ্বল ঝলমলে পোশাকে পাপ হচ্ছে। পূর্বে শক্তিহীন ও প্রজ্ঞাহীন হাতে পাপ হতো, এখন শক্তিধর ও প্রজ্ঞাবান হাতে পাপ হচ্ছে।

কেউ বলেছে, শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। মূর্খতা ও নিরক্ষরতাই অনিষ্টের শিকড় এবং সকল মন্দের মূল কারণ। জ্ঞান বেড়েছে, মানুষ নতুন নতুন প্রজ্ঞা অর্জন করেছে এবং শিখেছে নতুন-নতুন ভাষা। কিন্তু যাদের আত্মা নষ্ট, মস্তিষ্ক বক্র এবং হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ছিলো পাপ, তারা বিনাশ ও ধ্বংসের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে জ্ঞানকে। সহজ কথা হলো, কামারের যোগ্যতা যদি চোরের অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সেই চোর তালা ভাঙতে শিখবে। এখন যদি কারো মাঝে আল্লাহভীতি এবং মানবিক সহানুভূতি প্রবল না থাকে, অবিচার ও অত্যাচার তার স্বভাব হয়ে থাকে, তাহলে জ্ঞান তার হাতে অত্যাচার এবং দাঙ্গা

ও বিপর্যয়ের উপকরণ তুলে দেবে। তাকে শেখাবে চুরি আর পাপের নতুন-নতুন কলা-কৌশল।

কোন কোন লোক সংগঠনকে সংশোধনের উপায় মনে করেছে এবং তার সকল শক্তি ব্যয় করেছে মানুষকে সংগঠিত করার পিছনে। ফল হল এই যে, উচ্ছন্নে যাওয়া ব্যক্তিদের একটি বিভ্রান্ত সংঘ সংগঠিত হলো। যে কর্ম এতদিন পর্যন্ত অসংগঠিতভাবে হচ্ছিলো, এখন তা শুরু হলো সুসংগঠিতভাবে। এখন ষড়যন্ত্র এবং সংগঠনের মধ্য দিয়ে সংঘবদ্ধ চুরির ঘটনা ঘটতে লাগলো। মানুষ চরিত্র সংশোধন এবং হৃদয় ও আত্মশুদ্ধির দিকে তো দৃষ্টি দেয়নি। ভালো-মন্দ লোকদের সংগঠিত করাই কর্ম মনে করেছে। ফল হয়েছে এই যে, চরিত্রহীনতার শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে। আমি বলবো– ডাকাত, চোর, সন্ত্রাসী ও চরিত্রহীনদের নিয়ে যদি বিপর্যয়ের সংগঠন না হতো তাহলে ভালই হতো।

কেউ বলেছে, ভাষার বিভিন্নতা অধিক সংকট ও বিপর্যয়ের মূল কারণ। ভাষা এক ও সম্মিলিত হওয়া উচিত। ভাষার অভিন্নতা হলো দেশের উন্নতি, জাতির অগ্রসরতা এবং মানবতার সেবা। কিন্তু মানুষের চেতনার যদি পরিবর্তন না হয়, হৃদয়ের চাহিদা এবং মনের প্রবণতাগুলো যদি না বদলায়, তাহলে ভাষার পরিবর্তন কিংবা বচন অভিন্ন হয়ে যাওয়ায় কি বিশেষ কোন উপকার হবে? কল্পনা করুন, যদি পৃথিবীর সকল চোর ও অপরাধী অভিন্ন বচনে কথা বলে এবং একটি ভাষা বেছে নেয়, তাহলে পৃথিবীর কি লাভ হবে তাতে? এতে কি চৌর্যবৃত্তি আর অপরাধের দ্বার রুদ্ধ হবে? আমি কিন্তু মনে করি, চুরি ও অপরাধ কম হওয়ার স্থলে এ পরিস্থিতিতে আরো বেড়ে যাবে। এমনকি অপরাধী চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এতে আরো জটিলতার সৃষ্টি হবে।

কেউ বলেছে, সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্ম এবং মানবতার মহত্তম সেবা হলো, সংস্কৃতি এক করে ফেলা। কিন্তু আপনাদের কি জানা নেই যে, এখানে সংস্কৃতির তেমন কোন লড়াই নেই? এখানে লড়াই হলো অহমিকার।* 'আমি ছাড়া কেউ কিছু না' এই ধ্বংসাত্মক অহংবোধ এখানে ঠোকাঠুকি করছে। আমাদের অনেক পথনির্দেশক নেতৃবর্গ ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই বলতে শুরু করেছেন, যদি সমস্ত পৃথিবীর কালচার এক হয়ে যায়, তাহলে মানবতার তরী কুলের সন্ধান পাবে। যদি সমগ্র দেশের কালচার ও সংস্কৃতি এক হয়ে যায়, তাহলে এই দেশের অধিবাসীরা শান্ত ও পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বন্ধুগণ! সংস্কৃতির ঐক্য উপকারী কিছু নয়, উপকারী হচ্ছে হৃদয়ের ঐক্য। কবি ভুল বলেননি–

'উত্তম মনের ঐক্য, ভাষার ঐক্যের চেয়ে'।

---

* পঞ্চাশের দশকের ভারতের অবস্থাকে আপেক্ষিক বিশ্লেষণে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি এই কথাটি বলেছেন। –অনুবাদক

যদি মানুষ এক মনের না হয়, তবে ভাষার অভিন্নতা এবং সংস্কৃতির ঐক্যে কোন লাভ নেই। যে সব লোকজন গোড়া থেকেই এক ভাষাভাষী এবং যাদের সংস্কৃতি এক ও সম্মিলিত, তাদের মাঝে কী এমন ভালোবাসা ও ঐক্য বিদ্যমান? তারা কি একে অপরের প্রতি অবিচার করে না? তাদের একজন অন্যজনের সঙ্গে কি প্রতারণা করে না? তাদের মাঝে কেউ কি অপরের তুলনায় ব্যর্থ ও বিচলিত নয়? এক কালচার, এক সংস্কৃতি এবং একই ভাষার মানুষ কি পরস্পর লড়াই করছে না?

কেউ কেউ বলছে, পোশাক এক হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু যদি কোন মহারথীর অভ্যাস হয়ে যায় অন্যের কলার চেপে ধরার কিংবা পকেট কাটার, সে কি পোশাকের সম্মান করবে? সে কি শুধু এই কারণে তার ইচ্ছা পূরণ করা থেকে বিরত থাকবে যে, তার মতো পোশাক অন্যের গায়েও ঝুলছে। মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ যদি হৃদয়ে না থাকে, তবে পোশাকের প্রতি সম্মান আসবে কিভাবে? পোশাকের মূল্য ও মর্যাদা তো মানুষের কারণেই।

হৃদয়ের পরিবর্তনে জীবনের পরিবর্তন

মানুষ ও মানবতার যাবতীয় সমস্যা ও সংকটের সমাধান পোশাকের অভিন্নতা নয়, নয় ভাষা ও সংস্কৃতির সম্মিলন, নয় রাষ্ট্র ও দেশের ঐক্য, নয় জ্ঞান ও সম্পদ, নয় সংস্কৃতি ও সংগঠন, নয় উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য। এই সবগুলোর মাঝে কোন একটাও এমন শক্তি নয় যা পৃথিবী পাল্টে দিতে পারে। হৃদয়ের জগত যতক্ষণ পর্যন্ত না বদলায়, বাহিরের দুনিয়াও ততক্ষণ পর্যন্ত বদলাতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হৃদয়ের মুঠোর ভিতর। জীবনের সকল অবক্ষয় ও ধ্বংস হৃদয়ের পচন থেকেই শুরু হয়েছে। লোকে বলে, মাছ মাথা থেকে পচতে শুরু করে। আমি বলি, মানুষের পচন হৃদয় থেকে শুরু হয়। এখান থেকেই অবক্ষয় ও পচনের সূচনা হয় এবং সম্পূর্ণ যিন্দেগীতে তা ছড়িয়ে পড়ে।

স্বভাব পাল্টে দিয়েছেন পয়গাম্বরগণ

পয়গাম্বরগণ এখান থেকেই তাঁদের কাজ শুরু করতেন। তাঁরা খুব ভালো করেই বুঝতেন যে, এসব কিছুই মূলত হৃদয়ের অপূর্ণতা। মানুষের মনের ভিতর পচন ধরেছে। মনের ভিতরে চুরি, জুলুম ও প্রতারণার প্রতি উৎসাহ ও স্পৃহা জন্ম নিয়েছে। তার ভিতরে রিপুর আধিপত্য রয়েছে, যা সর্বদা তাকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে আর সে শিশুর মতো তার ইঙ্গিতে উঠা-বসা করছে। পয়গাম্বরগণ বলেন– সকল

মন্দের শিকড় হলো, মানুষ পাপী হয়ে গেছে। তার মাঝে মন্দ কাজের প্রেরণা এবং অকল্যাণের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান কাজ হলো, তার আত্মশুদ্ধি ঘটানো হোক এবং হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করা হোক।

মানুষকে তাঁরা ক্ষুধার্ত থাকতে দেখতেন। সেই দৃশ্য দেখে তাঁদের মন যে পরিমাণ ব্যথিত হতো, পৃথিবীতে অন্য কারুর মনে ততোটা ব্যথা হতো না। খানা-পিনা করা তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে যেতো। কিন্তু তাঁরা বাস্তবতাকে ভালোবাসতেন। তাঁরা সেটাকেই মূল সমস্যারূপে চিহ্নিত করে তার পিছু লেগে যেতেন না। কারণ, তাঁরা জানতেন যে, এটা অবক্ষয়ের ফল, মূল কারণ নয়। তাঁরা জানতেন, যদি লোকজনের উদরপূর্তির উপায় বের করে দেয়া হয় এবং অতিবিক্ত খাদ্য–খাবার ক্ষুধার্তদের হাতে তুলে দেয়া হয়, তবে তা একটি সাময়িক ও অস্থায়ী ব্যবস্থা হয়েই থাকবে। তাই তাঁরা এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করতেন যে, একজন মানুষের পক্ষে অন্য মানুষের ক্ষুধার চিত্র দেখাই যেন সম্ভব না হয় বরং নিজ গৃহ থেকে খাদ্য নিয়ে লোকজনের মাঝে বিতরণ করতে শুরু করে।

পক্ষান্তরে মানুষ এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, খাদ্য কুক্ষিগত ও একই স্থানে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। মনে রাখবেন, যদি চেতনার পরিবর্তন না হয় অথচ খাদ্য বন্টন এবং রসদের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়, তবে তারপরও মানুষের এমন কৌশল জানা আছে যে, অন্যের ঝুলির দানা নিজের ঝুলিতে চলে আসবে এবং চারদিক থেকে সম্পদ একত্রিত হয়ে নিজেদের পদতলে লুটিয়ে পড়বে। আপনারা সম্ভবত আলিফ লায়লার গল্প পড়ে থাকবেন। সওদাগর সিন্দাবাদ এক সফরে একবার এক স্থানে এসে দেখেন, জাহাজের কাপ্তান ভীষণ চিন্তিত ও অস্থির। সিন্দাবাদ কারণ জিজ্ঞাসা করলে জাহাজের মাঝি তাকে বললো, আমরা ভুলে এমন এক জায়গায় এসে পড়েছি, যার খুব নিকটেই চুম্বকের একটি পাহাড় রয়েছে। এখন থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের জাহাজ তার নিকটে পৌঁছে যাবে। চুম্বক লোহা আকর্ষণ করে। যখন সেই পাহাড় আকর্ষণ করবে, তখন জাহাজের সকল পেরেক এবং কাঠের ভিতরে গেঁথে থাকা লোহার কব্জাগুলো খুলে চলে যাবে সেই পাহাড়ে। জাহাজের বন্ধন তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমাদের জাহাজ ডুবে যাওয়া থেকে তখন আর বাঁচতে পারবে না। ঘটনা এমনই ঘটলো। চুম্বক লোহা আকর্ষণ করতে শুরু করলো এবং জাহাজে মজুদ সকল লৌহজাত দ্রব্য আকর্ষিত হয়ে চুম্বকের পাহাড়ের সাথে গিয়ে মিলে গেলো। ফলে দেখতে দেখতে জাহাজ ডুবে গেলো। ভাগ্যবান সিন্দাবাদ একটি কাঠের সাহায্যে কোনভাবে এক দ্বীপে আশ্রয় নিলো এবং তার জীবন রক্ষা পেলো।

এই গল্প মিথ্যা কিংবা সত্য যাই হোক, তা এখানে মুখ্য নয়। আপনাদেরকে আমার শুনানোর দায়িত্ব এটুকুই যে, আমাদের সমাজেও চুম্বকধর্মী পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী বিদ্যমান। আপনিও তাদের MAGNATE বলে থাকেন। তারা এমন ষড়যন্ত্র করে রাখে যে, সম্পদ একত্রিত হয়ে তাদের ঘরে জমা হয়ে যায়। তারা এমন অর্থনৈতিক জাল বিস্তার করে আছে যে, লোকেরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সবকিছু তাদের থলিতে তুলে দেয় এবং নিজেদের জীবনোপকরণ ও প্রয়োজনীয়তাগুলো তাদের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে পুনরায় দারিদ্র্য ও ক্ষুধার জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। পয়গাম্বরগণ হৃদয়ের প্রকৃতি পরিবর্তন করে দিতেন। তাঁরা মানুষের ভিতরে এমন পরিবর্তন সাধন করতেন যে, তারা অন্য মানুষের ক্ষুধার্ত মুখ দেখতেই পারতো না। মানুষের অন্তরজগতে তাঁরা সৃষ্টি করতেন আত্মত্যাগের উদ্দীপনা, বিলীন হওয়ার প্রেরণা এবং যথার্থ সহানুভূতির অঙ্কুর। অন্যের জীবন নিজের জীবনের চেয়ে অধিক মূল্যবান মনে হতো মানুষের কাছে। নিজের জীবন বিলীন করেও তখন তারা অন্যের জীবন রক্ষা করতে এগিয়ে আসতো। নিজের শিশুদের ভুখা রেখে অন্যের পেট ভরে দিতে উদ্বুদ্ধ হতো। নিজেকে হুমকির মুখোমুখি করে অন্যকে হুমকিমুক্ত করতে ভালোবাসতো।

ত্যাগের দু'টি ঘটনা

আমার এই কথাগুলো শুনে আপনারা অবাক হবেন না। এগুলো ইতিহাসের ঘটনা। আমাদের ও আপনাদের এই পৃথিবীতেই এমন হয়েছে। ইতিহাসে এমন সব ঘটনা বিবৃত হয়েছে, যা ফিল্ম কিংবা পর্দায় প্রদর্শিত অসংখ্য কল্প-কাহিনী থেকে অনেক অনেক বেশী অবাক করা ও বিস্ময়কর।

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমনের অল্পকাল পরের ঘটনা। এক মুসলমান তার এক আহত ভাইয়ের সন্ধানে পানি নিয়ে বের হয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যে, পানির প্রয়োজন হলে তখন আমি তার সেবা করতে পারবো। আঘাতপ্রাপ্ত, আহতদের মাঝে তিনি তার ভাইকে পেলেন, অসংখ্য আঘাতে জর্জরিত ও প্রচণ্ড পিপাসায় অস্থির। তিনি পেয়ালা ভরা পানি তার সামনে এগিয়ে দিলে আহত ভাই অন্য এক আহত ব্যক্তির দিকে ইশারা করলেন, আগে তাকে পানি পান করাও। ঘটনার পরিসমাপ্তি যদি এখানে ঘটতো, তাহলে মানবতার মহত্ত্বের জন্য তা যথেষ্ট হতো এবং তা ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনায় পরিণত হতো। কিন্তু ঘটনা এখানে শেষ হতে পারেনি। দ্বিতীয় আহত ব্যক্তির সামনে পানি ভর্তি পেয়ালা ধরা হলে তিনিও আরেকজনের দিকে ইশারা করলেন। এমনিভাবে প্রত্যেক আঘাতপ্রাপ্ত, আহত ব্যক্তি তার পার্শ্ববর্তী

ব্যক্তির দিকে ইশারা করতে থাকলেন। অবশেষে চক্র শেষ হয়ে পেয়ালা যখন প্রথমজনের কাছে ফিরে এলো, তখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে লোকান্তরে চলে গেছেন। দ্বিতীয়জনের কাছে পৌছতে পৌছতে তিনিও নীরব হয়ে গেছেন। এই ধারায় একের পর এক সেখানকার সকল আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিই দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসে তাঁদের এক অমূল্য পদচিহ্ন রেখে গেছেন। আজ যখন ভাই ভাইয়ের পেট কাটছে, এক মানুষ অন্য মানুষের মুখ থেকে কেড়ে নিচ্ছে রুটির টুকরা, তখন এই ঘটনা অত্যুজ্জ্বল আলোকের এক আদর্শমণ্ডিত মিনার।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একবার কিছু মেহমান এলেন। তাঁর কাছে খাবার কিছুই ছিলো না। তিনি ঘোষণা দিলেন, 'কে নিজের বাড়ীতে এদের নিয়ে যেতে চাও?' সাহাবী আবু তালহা আনসারী (রা.) নিজেকে পেশ করলেন এবং মেহ্মানদের নিয়ে গেলেন। বাড়িতে খাবার ছিলো কম। বাড়ির ভিতরে স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ হলো, বাচ্চাদের ঘুম পড়িয়ে দেয়া হবে এবং মেহ্মানদের সামনে খাবার রেখে বাতি নিভিয়ে দেয়া হবে। পরে তাই হলো। মেহ্মানগণ পরিতৃপ্ত হয়ে খেলেন। অন্যদিকে আবু তালহা (রা.) হাত নেড়ে-চেড়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় উঠে পড়লেন। অন্ধকারে মেহমানগণ জানতেই পারলেন না যে, তাদের মেযবান খাবারে শরীক না হয়ে শূন্য হাত মুখ পর্যন্ত শুধু আনা-নেওয়া করেছেন।

মানবতার বৃক্ষ সতেজ হবে ভিতর থেকে

মানুষের অন্তরজগতে পরিবর্তন সাধন করতেন পয়গাম্বরগণ। তাঁরা ব্যবস্থা পাল্টানোর চেষ্টা ততটা করতেন না, যতটা করতেন চেতনা বদলানোর কোশেশ। বিধি-ব্যবস্থা তো চেতনারই অনুগত হয়। যদি হৃদয় না বদলায়, চেতনা না পাল্টায়, তাহলে কিছুই পাল্টায় না। মানুষ বলে, দুনিয়া খারাপ, সময় খারাপ। আমি বলি, এগুলো কিছুই না বরং খারাপ হলো মানুষ। মাটির অবস্থার ভিতরে কি কোন পরিবর্তন হয়েছে? বাতাসের প্রভাব কি বদলে গেছে? সূর্য কি উত্তাপ ও আলো বিকিরণ বর্জন করেছে? আকাশের অবস্থায় কি পরিবর্তন এসেছে? কোন্ বস্তুটির স্বভাবে (NATURE) পরিবর্তন হয়েছে?

মাটি তো একই রকমভাবে স্বর্ণ-উদ্গীরণ করছে; তার বুক ভেদ করে উৎপন্ন করছে শস্যের ভাণ্ডার, ফলমূলের স্তূপ। কিন্তু বন্টনকারী পাপী হয়ে গেছে। এই অত্যাচারীরা যখন নিজেদের প্রয়োজনীয়তার তালিকা তৈরী করে, তখন কাগজের স্তূপও তাদের যথেষ্ট হয় না। অন্যদিকে যখন অন্য লোকজনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাবে, তখন যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রজ্ঞা সে তালিকা সংকুচিত করার ক্ষেত্রে

ব্যয়িত হয়। এই প্রবণতা যতদিন না পাল্টাবে, মানবতা ততদিন আর্তনাদ করতে থাকবে। পয়গাম্বরগণ হৃদয়রাজ্যে ইঞ্জেকশান পুশ করেছেন, লোকেরা বহিরাবরণ টিপটপ করছে এবং তাতেই সকল সামর্থ্য ব্যয় করছে। পয়গাম্বরগণ অন্দর রাজ্য নিয়ে ভেবেছেন, ভিতরে অপারেশন করেছেন।

আজ সমগ্র পৃথিবীতেই ভিতর থেকে মানবতার বৃক্ষ শুকিয়ে যাচ্ছে। তার উদর ফাঁপিয়ে তুলছে ঘুণ ও উঁই পোকা। কিন্তু কালের চিকিৎসকরা উপর দিয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে পানি। বৃক্ষের অন্তরের সতেজতা এবং তার বর্ধনশক্তি প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রায় মৃত সেই বৃক্ষের পাতাগুলোকে সবুজ-সতেজ রাখার জন্য বায়ু (GASES) প্রবাহিত করা হচ্ছে, পানি ছিটানো হচ্ছে, যাতে শুকিয়ে যাওয়া গাছ-পাতা শ্যামল হয়ে উঠে। পয়গাম্বরগণ এই ব্যর্থ চেষ্টার পরিবর্তে মানুষকে মানুষ বানানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। মানুষের হৃদয়ে তাঁরা ঈমানী ইঞ্জেকশান দিয়ে গেছেন এবং ঘোষণা করেছেন, হে আত্মভোলা মানুষ! আপন স্রষ্টাকে জানো এবং ঘুমে-জাগরণে, চলতে-ফিরতে তাঁকে পর্যবেক্ষকরূপে গ্রহণ করো যাঁর তন্দ্রাও আসে না, নিদ্রাও আসে না।

মানবতার যথার্থ পথনির্দেশক

মানুষের হৃদয় ও আত্মা থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত ভালোবাসার ঝর্ণা না ছুটবে, মনের ভিতরে না জন্মাবে আত্মত্যাগের প্রেরণা, মানবতার সংশোধন ততক্ষণ পর্যন্ত অসম্ভব। তাই তাঁরা এমনি মানবিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছেন যে, তার ফলে অন্য ভাইয়ের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা এবং কষ্ট বরণ করার স্পৃহা জেগে উঠে। নিছক আইনের সাহায্যে তাঁরা মানুষের চিকিৎসা করেননি বরং মানুষের ভিতরে প্রকৃত মানবতা এবং মানবতার প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা এমন জাতি সৃষ্টি করেছেন, যে জাতি মানবতার প্রদর্শনী (DEMONSTRATION) করে এ সত্য প্রতিষ্টিত করেছে যে, আমরা ভুড়ি, উদর আর মাথার দাস নই। তারা পরিস্থিতি ও কর্মের ভাষায় ঘোষণা করেছে— পেট, আবেগ, সম্পদ, শাসক ও আত্মীয়-পরিজনের পূজারী তারা নয়। এমন জাতির উদ্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত না হয়, মানবতার সংশোধন ও উত্তরণ ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়।

যদি কোন দেশে এমন জাতির জন্ম হয় যারা নিজেদের ভুলে গিয়ে সকলের কল্যাণ করবে, তাহলে তাদের দ্বারা সম্ভব হবে মানবতার সংশোধন। ইতিহাস

সাক্ষ্য দেয়, মানবতার অনেক বড় বড় কল্যাণকামীই অতিবাহিত হয়েছেন। কিন্তু কোন না কোন ধাপে এসে আপনি দেখবেন যে, তারা নিজেদের আখের গুছিয়ে ফেলেছেন। জাতির এমন বহু সেবক অতিবাহিত হয়েছেন, যারা জাতিশুদ্ধির কাজ করেছেন বড়ই দুঃসময়ে, জেল খেটেছেন; কিন্তু অবশেষে কারাগার থেকে বের হয়ে এসে শাসকের মসনদে আরোহণ করেছেন। সেটা তাদের প্রাপ্য ছিলো হয়তো। সে জন্য তাদের ধন্যবাদ।

পয়গাম্বরগণের যিন্দেগী

কিন্তু আল্লাহর পয়গাম্বরগণ আত্মত্যাগ করেছেন স্বার্থহীনভাবে। পৃথিবীর শান্তির স্বার্থে তাঁরা আপন আয়েশ বিসর্জন দিয়েছেন। তারা একশত ভাগ অন্যের উপকারের জন্য কষ্টকর জীবন যাপন করেছেন, নিজেদের লাভ এক ভাগও উঠাননি। তাঁদের সাহাবী-সহচররা যে পথে চলেছেন, পৃথিবী উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। তাঁদের লাগিয়ে যাওয়া বাগানের ফল পৃথিবী আজও ভোগ করছে; সে বাগান তারা সজীব করে তুলেছেন নিজেদের তপ্ত খুন সিঞ্চিত করে। তাঁরা অন্যের ঘর আলোকিত করেছেন প্রদীপের সাহায্যে, কিন্তু মৃত্যুর সময় পর্যন্ত নিজেদের ঘরগুলো ছিল আলোর সুবিধা বঞ্চিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিয়ে যাওয়া আলোকপ্রভায় গরীবের ঝুপড়ি আর শাহী প্রাসাদ একই সাথে ঝকমক করেছে, কিন্তু ওফাতের প্রাক্কালে তাঁর ঘরের বাতি চেয়ে–আনা তেলের বিনিময়ে জ্বলেছে। অথচ তখন মদীনার হাজার-হাজার ঘরে তাঁরই হাতে প্রজ্জ্বলিত বাতির অনির্বাণ শিখা জ্বলছিলো। তিনি বলতেনঃ

আমরা পয়গাম্বরগণ; কারুর উত্তরাধিকারী হই না, আমাদেরও কোন উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যা কিছু রেখে যাই, তা গরীবের হক।'

এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তাঁর আরেকটি ঘোষণা হলোঃ যদি কেউ মৃত্যু বরণ করে এবং কিছু রেখে গিয়ে থাকে, তা তার উত্তরাধিকারীদের ধন্য করুক। আমরা তা থেকে এক পয়সাও নেবো না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঋণ রেখে গেছে, তা আমাদের দায়িত্বে থাকবে।

দুনিয়ার কোন শাসক ও নেতা কি এই আদর্শ রেখে গেছেন? তাঁর জীবন হলো মানবতার উজ্জ্বল কীর্তি। তিনি পৃথিবীর সামনে এমন আদর্শ তুলে ধরেছেন যাতে আত্মোৎসর্গ ও প্রেম এবং অন্যের বেদনায় ব্যথিত হওয়ার পরিবর্তে কোথাও একরত্তি পরিমাণও আত্মস্বার্থের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। আরবের

একমাত্র বাদশাহ্ তিনি ছিলেন, যাঁর সাম্রাজ্য ছিলো মানুষের হৃদয়রাজ্যে বিস্তৃত। কিন্তু দুনিয়া থেকে আস্তিন বাঁচিয়ে নির্ভোগ তিনি চলে গেলেন। তিনিই শুধু নন, যিনি যতো তাঁর নিকটবর্তী ছিলেন, তিনি ততো ঝুঁকির নিকটবর্তী এবং লাভ থেকে দূরে ছিলেন। নিজের গৃহিনীদের ঘোষণা করে বলে দিয়েছেন, যদি দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ চাও, তবে যৎসামান্য কিছু দিয়ে আমি তোমাদেরকে বিদায় দিয়ে বাড়িতে রেখে আসবো। সেখানে তোমরা ফিরে যাও এবং সুখ-শান্তির জীবন কাটাও। আমার কাছ থেকে বিচ্ছেদ বরণ করে নাও। আমার সাথে থাকতে হলে দুঃখ-সংকট বরদাশ্ত করতে হবে। এই ছিলো সেই আদর্শের উপহার। এর প্রতিই আল্লাহ্র পুরস্কার অবতারিত হয়।

আমরা চাই পুনরায় এই যিন্দেগী ব্যাপকতা লাভ করুক। মানবতার স্বার্থহীন সেবা এবং উদ্দেশ্যমুক্ত ভালোবাসার প্রচলন হোক। আবারো অন্যের কল্যাণে নিজের ক্ষতি গ্রহণ করে নেয়া হোক এবং পুনরায় এমন জাতির জন্ম হোক, বিপজ্জনক মুহূর্তে যারা এগিয়ে আসে এবং লাভের সময় পিছিয়ে থাকে।

চাহিদা পূরণ শান্তির পথ নয়

আজ দুনিয়ার সকল ক্ষমতা ও প্রশাসন এই এক বৃত্তের ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে যে, জাতি-গোষ্ঠী ও শ্রেণীসমূহকে সার্বিকভাবে তুষ্ট রাখা হোক এবং চাহিদা মাত্রই পূরণ করা হোক। কিন্তু জ্ঞানী বন্ধুরা! সংশোধন ও পরিমার্জনের পথ এটা নয়। এখানে একজন মাত্র মানুষের চাহিদাও পূরণ করা দুষ্কর। চাহিদার অবস্থা হলো এই যে, তা অসীম ও অশেষ। অথচ দুনিয়াটা সীমিত, সংক্ষিপ্ত এবং কোটি মানুষের জন্যে সম্মিলিত। ইতিহাসের জগতটা যদি দেখা হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীর মাত্র একজন মানুষেরও মুখে চাওয়া চাহিদা পূর্ণ করার অবকাশ নেই। এখানে কোন আবদারকারীর আবদারই পূরণ হতে পারে না। এখানে প্রবৃত্তি তোষণে আগ্রহীরা ডেকে ডেকে বলছে–

পাপের সমুদ্র পানি শূন্যতায় শুকিয়ে গেলো

আমার আঁচলের কোণ্টাও তো এখনো ভিজলো না।

আজ পৃথিবীর বড় বড় নেতৃবৃন্দ একথা বলছেন যে, মানবিক চাহিদা সবই বৈধ ও স্বাভাবিক। সব চাহিদা পূরণ হওয়া উচিৎ। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে এটাই কার্যকর হচ্ছে।

মৌলিক ত্রুটি এটিই। চাহিদা ও প্রবৃত্তি মিটানো ও পূরণ করার দ্বারা মানবতার উত্তরণ হতে পারে না। চাহিদা পূরণ দ্বারা চাহিদা কমে যাবে না এবং হৃদয়ে প্রশান্তি জন্মাবে না। এটাতো সমুদ্রের পানি। এর সাহায্যে পিপাসা যতই মিটানো হবে, পিপাসা ততই তীব্র হতে থাকবে। আজ সমগ্র পৃথিবীর প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতি এই দর্শনকে অবলম্বন করেই কাজ করছে যে, মানুষের শুদ্ধ-অশুদ্ধ চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা হোক। জাতি, শ্রেণী, জনতা এবং ব্যক্তি যা চাইবে, তা-ই দেয়া হোক। এতে শান্তি আসবে। নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ফলাফল হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ সবদিকেই আগুন লেগে গেছে। আত্মার আগুন কিছুতেই নেভে না। প্রবৃত্তির একটি সলতে জ্বলে চলেছে। সকল জাতি তাতে ইন্ধন ও বাতাস দিয়ে যাচ্ছে। সেই সলতের দাউ দাউ অগ্নিশিখা আজ আকাশের সাথে কথা বলছে। জাতি ও রাষ্ট্রের দিকেও তা এগিয়ে আসছে। আজ 'দোযখের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' আয়াতের এই মর্মের দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষ এ আগুনের অভিযোগ উঠাচ্ছে। কিন্তু ভাববার বিষয় হলো, এ আগুন কে জ্বেলেছে? কে জ্বেলেছে এ সলতে? কে তাতে তেল ছিটিয়েছে? কে যুগিয়েছে ইন্ধন? প্রবৃত্তি পূরণের পথের এটাই পরিসমাপ্তি ও গন্তব্য।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, যারা জাতির সকল প্রবৃত্তি ও দাবী পূরণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন এবং সাথে সাথে তাদের বিনোদন ও প্রসন্নতার উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করাও দরকারী ভাবেন, তারা নিজেদের সন্তানদের সাথে কিন্তু এই আচরণ করেন না। সন্তানের বহু ভুল ও ক্ষতিকর চাহিদা তারা অপূর্ণ রাখেন। শিশুরা যদি আগুন নিয়ে খেলতে চায়, তাহলে তাদের খেলতে দেয়া হয় না। কিন্তু জাতির সকল চাহিদা ও দাবী পূরণে তারা প্রস্তুত। তাহলে এরা যা করছেন, তাতে কি অনুমিত হয় না যে, নিজের দেশবাসী বা সাধারণ মানুষের সাথে আপন সন্তানতুল্য সহানুভূতি এদের নেই? এই লোকেরাই বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতির উপর শাসন চালান, তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য এবং জনগণের রায় লাভের স্বার্থে সকল শুদ্ধ-অশুদ্ধ চাহিদা পূর্ণ করা অপরিহার্য মনে করেন। আজ কোন দেশেই এমন কোন দল নেই এবং কোন ব্যক্তির মাঝেও এই চারিত্রিক সৎসাহস নেই যে, তারা বিনোদন ও বিলাসিতার সমালোচনা করবেন; খেল-তামাশার ক্রমবর্ধমান আগ্রহ, তামাশা, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ও ফিল্মায়নের সীমাতিরিক্ত উৎসাহ ও স্পৃহার প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করবেন। আজ এমন কোন রাষ্ট্র নেই, যে রাষ্ট্র এই বিষয়গুলোর উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে এবং জাতি ও দেশবাসীর অসন্তুষ্টি বরণ করে নিবে।

চাহিদার মাঝে ভারসাম্য সৃষ্টি এবং সঠিক চেতনার জাগরণ

আল্লাহ্‌র পয়গাম্বরগণের পথ উপরিউক্ত পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা বৈধ-অবৈধ চাহিদা পূরণের পরিবর্তে চাহিদার উপর মাত্রা লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা চাহিদার গতি পাল্টিয়ে দিয়েছেন এবং শুধুমাত্র বৈধ চাহিদাগুলোকে পূরণের উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। জীবন্ত ও জাগ্রত অন্তর তাঁরা সৃষ্টি করেছেন। এতে জীবনে ভারসাম্য এবং হৃদয়ে প্রশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তোমাদের বিদ্যালয়, পরীক্ষাগার, গবেষণাক্ষেত্র (LABORATORIES), তোমাদের বিজ্ঞান পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়েছে। বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ এ সবের অবদান। কিন্তু এগুলো মানুষকে পবিত্র একটি হৃদয় উপহার দিতে পারেনি। তোমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের হাত খুলে দিয়েছে। শিশুদের হাতে তুলে দিয়েছে হাতিয়ার। কিন্তু তাদের যথার্থ প্রশিক্ষণ হয়নি। আজ সেই অশিক্ষিত শিশুর দল আমোদ-প্রমোদ করে সেই হাতিয়ারগুলোর স্বাধীন ব্যবহার করে চলেছে।

আল্লাহ্‌র পয়গাম্বরগণ চাহিদার উপর প্রহরী বসিয়েছেন। চাহিদার মাঝে পরিমাপ ও ভারসাম্য সৃষ্টি করেছেন। রিপুতাড়িত চাহিদার পরিবর্তে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার এক মহান চাহিদার জন্ম দিয়েছেন। মানবিক সহানুভূতি ও সমবেদনার প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা বস্তু আবিষ্কার করেননি। কিন্তু এমন মানসিকতা তাঁরা সৃষ্টি করেছেন, যার দ্বারা আল্লাহ্‌প্রদত্ত ও মানুষের তৈরীকৃত বস্তু ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। তাঁরা হৃদয় দিয়েছেন, বিশ্বাস দিয়েছেন। আজ পৃথিবীর কাছে সবকিছু আছে, বিশ্বাস নেই। আজ পৃথিবীর শিল্প-কারখানা সবকিছু উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু একীন ও বিশ্বাস অর্জিত হয় পয়গাম্বরগণর কারখানা থেকে। আজ পৃথিবী আল্লাহভীরু লোক-শূন্য। মানবতার স্বার্থহীন সেবা কে করবে? অথচ আল্লাহভীতি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বিশ্বাস মানবতার নিঃস্বার্থ সেবায় উৎসাহিত করে। মানবতার এমন সেবকরা সকল শ্লোগান, রাষ্ট্রশাসনের মোহ, রাজনৈতিক চাল এবং রাজনৈতিক ভাঙ্গা-গড়া থেকে বিমুখ ও প্রতিক্রিয়াহীন থেকে নিঃস্বার্থ সেবা করে যান। আজ এমন সেবকের প্রয়োজন, যাদের কাছে কিছুই নেই, তারপরও কিছু নিতে চায় না; বরং চায় আরো দিতে।

শেষ আহবান

আমরা মানুষের মাঝে এই আবেগ সৃষ্টি করতে চাই এবং এই বাস্তবতার তৃষ্ণা জাগাতে চাই যে, জীবন শুধুমাত্র খানা-পিনার নাম নয়। মানুষের জীবন

নিছক বস্তুকেন্দ্রিক অথবা জান্তব জীবনের নাম নয়। আমরা এক নতুন স্বাদ ও রুচি নিয়ে এসেছি। আজকের বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীতে এ কথা নতুন। অবশ্য এক অর্থে এ কথা নতুন নয়। পৃথিবীর সকল পয়গাম্বরগণ এই পয়গাম নিয়েই এসেছেন এবং সবচেয়ে বেশী দৃঢ়তা ও স্পষ্টতার সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চূড়ান্ত পর্যায়ে একথা বলে গেছেন। এই বাস্তবতা আজ চৌমাথায় দাঁড়িয়ে বলার উপযোগী। মানুষ পেটের চার পাশে চক্কর দিচ্ছে। প্রকৃত জীবন শেষ নিঃশ্বাস ফেলছে। মানবতার পুঁজি লুণ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। আমরা একটি ডাক দিতে এসেছি, সত্যের ডাক, হকের-ডাক। সাম্প্রতিক দুনিয়া এ ডাকের সাথে অপরিচিত। কিন্তু আমরা পৃথিবী থেকে নিরাশ নই। মানুষের কাছে এখনও হৃদয় আছে। সে হৃদয় মৃত নয়। তার উপর ধুলা-বালির আস্তর পড়েছে। ধুলা-বালি ঝেড়ে আবর্জনা পরিষ্কার করে নিলে এখনো অবকাশ আছে, এখনো সম্ভাবনা আছে যে, তা হক গ্রহণ করে নিবে এবং তার ভিতর ঈমানী অনুভূতি জাগ্রত হয়ে উঠবে।

মানুষ আত্মপূজারী এবং আত্মবিস্মৃত

[ভারতের গাজীপুর শহরের টাউন হলে ১৯৪৫ ইং সনের ২২ জানুয়ারী ভাষণটি প্রদত্ত হয়। হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ভাষণটির শ্রোতা ছিলেন]

মানুষ ও পশুর পার্থক্য

মানুষ ও পশুর মাঝে অনেক বড় একটি পার্থক্য হলো এই যে, পশুর মাঝে তার অবস্থান ও অবস্থার বিষয়ে কোন অস্থিরতা ও অপ্রসন্নতা নেই এবং নেই আপন-যিন্দেগীর উন্নতি সাধনের কোন যোগ্যতা। কিন্তু মানুষের সেই অনুভূতি আছে। আমরা-আপনারা আমাদের জীবনের ব্যাপারে অস্থিরচিত্ত ও অপ্রসন্ন। সাধারণত এই অপ্রসন্নতাকে খারাপ মনে করা হয়। কিন্তু এই অস্থিরচিত্ততা–যা মানবজীবনের মূল– যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে আবার জীবনের সৌন্দর্য ও আগ্রহ ফুরিয়ে যাবে। সকল মানুষই জীবন সম্পর্কে খেদোক্তি করে থাকে এবং অধিকাংশ আলোচনাই এই অপ্রসন্নতাকে ভিত্তি করে আবর্তিত হয়। লক্ষ্যণীয় হলো, এই অপ্রসন্নতা ও অস্থিরচিত্ততা দূর করার চিন্তা এবং তার উপায়-অবলম্বন নিয়ে ভাবনার কষ্ট করাটাকে নিতান্ত অল্প কিছু মানুষ উচিত মনে করে। কারণ এ এক মহাদায়িত্বের বিষয় এবং মানুষ দায়িত্বকে ভয় পায়, দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে থাকে।

যদি কোন যন্ত্র অথবা একটি ঘড়িতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তাহলে তা ফেলে দেওয়া ও ভেঙে দেওয়ার দ্বারা সেটা ঠিক হয় না বরং সহজ ও সুন্দরভাবে তার মেরামত করলেই তার দ্বারা কার্যোদ্ধার করা সম্ভব। ভাবতে হবে এভাবেই। ভাবতে হবে, মানবতা এখন তার আপন অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে কিনা এবং সমস্ত অবক্ষয় ও অস্থিরচিত্ততা কি মানবতার অবনতি ও পতনেরই ফল কিনা যার দায়-দায়িত্ব বহন করছি আমরা–আপনারা সবাই?

আপন সত্তাই প্রিয় মানুষের

মানুষের ভালোবাসা সর্বাধিক হলো, আপন সত্তার সাথে। অন্য যার প্রতি যতোটা ভালবাসা আছে, তা নিজ সত্তার সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই। প্রত্যেক

ভালোবাসার মাঝে মানুষের আপন সত্তা লুকায়িত থাকে। তা দেখার জন্যে দরকার এক অতি সূক্ষ্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের। প্রেমদর্শন নিয়ে ভাবুন, দেখা যাবে আপনার প্রতি যদি কোন মানুষের ভালোবাসা থাকে, কোন না কোনভাবে তার প্রতি আপনারও ভালোবাসা থাকবে। বস্তুত সন্তান, ভাই এবং বন্ধুদের প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে নিজের প্রতি ভালোবাসাই ক্রিয়াশীল। মানবিক প্রেম-মহব্বত পর্যবেক্ষণের জন্য গভীর মনস্তত্ত্বসম্পন্ন সূক্ষ্মদৃষ্টি অনিবার্য। যদি আপন সত্তার প্রতি মানুষের ভালোবাসা না থাকতো, তাহলে এই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনাই উলট-পালট হয়ে যেতো। এখন তো একথাও স্বীকৃত হচ্ছে যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দর্শনও মূলত একটি সম্বন্ধ ও ভালোবাসার বিষয় যা সৌরজগতের ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখছে। এই পৃথিবীতে যে উজ্জ্বলতা, বর্ণবৈচিত্র এবং সৌকর্য-প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়, তার সবই আপন সত্তার প্রতি মানুষের আগ্রহ পোষণের ফলাফল। আপন সত্তার প্রতি যদি মানুষের আগ্রহ না থাকতো, তবে হাট-বাজার, কল-কারখানা এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের তৎপরতা স্তব্ধ হয়ে যেতো। কেননা আত্মিক উৎসাহ অন্য কিছুর প্রতি নিজেকে বাদ দিয়ে হয় না বরং আপন সত্তার প্রতি প্রেমই মানুষকে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সাথে সম্বন্ধ বা ভালোবাসা রাখতে বাধ্য করে। এটা লক্ষ বছরের পুরাতন ও স্বভাবজাত বাস্তবতা। এই পৃথিবীতে যা কিছু শক্তি, সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা আপনি লক্ষ্য করেন, তা এ তত্ত্বেরই ফলাফল যে, মানুষ নিজ সত্তাকে ভালোবাসে। মানুষ এই পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র এবং তার চারপাশেই সব কিছু চক্কর খাচ্ছে। যদি মানুষ আপন সত্তার প্রতি আগ্রহ না রাখে এবং সত্তাকে ভুলে যায়, আপন বাস্তবতা সম্পর্কে অনবগত থাকে এবং আপন সত্তাকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে ফেলে, তবে প্রচণ্ড অনিয়ম দেখা দিবে, প্রকাশ পাবে নিদারুণ সমস্যা ও বিশৃঙ্খলা।

একটি মানসিক মহামারি

মানুষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, নিজের প্রকৃত রূপ চেনা, নিজের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং একথা উপলব্ধি করা যে, এই সমস্ত পৃথিবী আমারই জন্য বানানো হয়েছে– মানুষই এ জগত সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। উপকরণকে উপকরণ এবং উদ্দেশ্যকে উদ্দেশ্য হিসেবেই গ্রহণ করা উচিৎ। মানবেতিহাসের এ এক সংকটজনক অধ্যায় ও রুগ্ন মানসিকতার মহামারি যে, মানুষ তার আপন সত্তাকে ভুলে যায় এবং নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপকরণ-অবলম্বনকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিনতে পারে না, উপায়-উপকরণকে সে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মনে করে বসে থাকে। মানুষের মাঝে এই আত্মবিস্মৃতির অবস্থান একটি ভয়াবহ ব্যধি। যখন সে

একথা ভুলে বসে থাকে যে, সে কোন্ মর্যাদায় অভিষিক্ত এবং তার অবস্থান ও দায়িত্ব কি, তাহলে তাকে দিয়ে কোন্ ভূমিকা পালিত হবে এবং এই জগতের সাথেই- বা তার সম্পর্ক আর কি থাকে?

* এই যুগে এক বিশেষ রকম মানসিক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত। দৃশ্যত দেখা যায়, মানুষ এ যুগে তার আপন সত্তার প্রতি যে পরিমাণ আগ্রহ পোষণ করছে, নিজের জন্য যে কষ্ট ও শ্রম দিচ্ছে এবং যে সব উদ্ভাবন-আবিষ্কার ও শিক্ষা-প্রযুক্তি পরিবেশিত হচ্ছে, তাতে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে যে, আপন সত্তার প্রতি যে আগ্রহ মানুষের এ যুগে রয়েছে, এমন আগ্রহ অতীতের কোন কালে ছিলো না। অতীতে মানুষ যেন ঘুমিয়ে ছিলো, এখন জেগে উঠেছে। জীবনকে যেমন কৃত্রিমতাপূর্ণ ও বিলাসপ্রবণ করে তোলা হয়েছে, তাতে এই দাবি উত্থাপিত হয় যে, এ যুগেই আপন সত্তার প্রতি মানুষের আগ্রহ ও ভালোবাসা সর্বকালের চেয়ে অধিক। মানুষ তার নিজের জন্য যে পরিমাণ মেধা ও শক্তি প্রয়োগ করছে, ইতিহাসে কখনো এরকম হয়নি। দৃশ্যত এ যুগেই মানুষ তার নিজের প্রতি সীমাহীন মমতাবান। নতুন পোশাক, আশ্চর্য সুস্বাদু খাবার এবং ভোগবিলাসের কত উপায়-উপকরণ উদ্ভাবিত হয়েছে এ যুগে।

এ যুগের আত্মবিস্মৃতি

পক্ষান্তরে আমি নিবেদন করবো যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার আপন সত্তা, মনুষ্যত্ব, প্রাণ, স্বীয় রুচি ও আনন্দকে যে পরিমাণ এযুগে ভুলেছে, কখনো এমন ভোলেনি, কখনো এমন ভুল তাদের অতীতে হয়নি। মানুষ এ সময়ে নিজ সত্তা ও নিজের একান্ত সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তার চিন্তা সবচেয়ে কম করছে। অন্যদিকে যে সমস্ত বস্তু তার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সবের জন্য করছে জীবনোৎসর্গ। বাহ্যিক চাকচিক্য, মিথ্যা তাড়না এবং নিষ্প্রাণ স্ফূর্তি তার উপর এমনভাবে চেপে বসেছে যে, নিজের আত্মা ও প্রকৃতিকে সে একদম বিস্মৃত হয়ে গেছে।

বস্তুত এযুগ বিপরীত দুটি দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে চলেছেঃ একটি বাহ্যিক, অন্যটি আত্মিক। যদি পরখ করে দেখা হয়, তাহলে জানা হয়ে যাবে যে, এই বস্তুগত উন্নতির যুগে মানুষ তার আধ্যাত্মিক প্রাণ, বাস্তব লক্ষ্য এবং জীবনের মূল আনন্দকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছে– ইতিহাসে যার উপমা পাওয়া যাবে না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, মানুষ এখন তার দায়িত্ব জানে না, তার ব্যাধি নিয়ে সুস্থির ভাবনা তার হয় না। এখন সে উপায়-উপকরণকে লক্ষ্য বানিয়ে বসে আছে। মানুষ কেন সে সব বস্তুর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে, যেগুলো তারই জন্য

তৈরী? একটু ভাবুন! চিন্তা করুন! মানুষ কি তার নিজের সত্তা সম্পর্কে অবহিত? আপন-আপন জীবনের হিসাব নিন। মানুষ কি তার প্রকৃত শান্তির কথা স্মরণ রাখে? কখনো না।

বরং মানুষের মন-মস্তিস্কে এখন এক অদ্ভুত উন্মাদনা ক্রিয়াশীল। সে এক বিস্ময়কর খেলায় মেতে আছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি চক্করে চলছে। জন্তু-জানোয়ারেরও অধিক পরিশ্রম করছে। এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা নিজেদেরকে নিছক অর্থ উৎপাদনের মেশিন বানিয়ে রেখেছে।

নিষ্ফল প্রয়াস

আমার শৈশবে দেখেছি, শিশুরা এক ধরনের খেলা খেলতো। প্রশ্ন করা হতো 'বুড়িরে বুড়ি কি খুঁজছো? উত্তর আসতো– 'সুই'। প্রশ্ন হতো– 'সুই দিয়ে কি করবে'? উত্তর আসতো– 'থলি সেলাই করবো'। প্রশ্ন হতো– 'থলি দিয়ে কি করবে'? উত্তর আসতো– 'টাকা রাখবো'। প্রশ্ন হতো– 'টাকা দিয়ে কি করবে?' উত্তর আসতো– 'গাভী কিনবো'। প্রশ্ন হতো– 'গাভী দিয়ে কি করবে'? উত্তর আসতো, 'দুধপান করবো'। তখন অপর প্রান্ত থেকে নতুন প্রশ্ন না করে জবাব দেয়া হতো– 'দুধের পরিবর্তে মূত (প্রস্রাব) পান করবে'। আজ সমগ্র পৃথিবী এই খেলাই খেলছে। নিজস্ব পরিশ্রমের বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবীর যা অর্জন করার কথা ছিলো, তার পরিবর্তে উদ্দেশ্যহীন ও অবাস্তব বিষয়বস্তুতে সে নিমগ্ন হয়ে আছে। মানুষ শিক্ষা অর্জন করছে অর্থ উপার্জনের জন্য। অর্থ উপার্জন করছে ভোগ-বিলাসের জন্য। এ এক ধারাবাহিক ও সমাপ্তিহীন শেকলের মতো, যার মাঝে সকল মানুষ বাঁধা পড়ে আছে। মানুষ যার জন্য সবকিছু করছে, তাকে ভুলে যাচ্ছে। আজ প্রকৃত জীবনলক্ষ্য সম্পূর্ণ বিস্তৃত হয়ে গেছে। যিন্দেগীর সম্পূর্ণ সফর যদি দেখা হয়, তাহলে জানা যাবে– মানবতা যার জন্যে এগিয়ে ছিলো সেটা তার পথ নয়।

মানুষের উপর মুদ্রার শাসন

মুদ্রা কেন? তার মূল্য তো এজন্যই যে, মানুষ তা ব্যবহার করে। মানুষই অচল ও নিষ্প্রাণ মুদ্রার জীবন দিয়েছে, দিয়েছে চলৎশক্তি। কিন্তু মুদ্রার অর্থতো এ নয় যে, আপনি তার সাথে প্রেম করবেন। যে কাজ তার দ্বারা নেওয়া প্রয়োজন ছিলো, তার দ্বারা সে কাজ নেওয়া হচ্ছে না, বরং মুদ্রা এখন মানুষের উপর শাসন চালাচ্ছে। এই মুদ্রার জন্যই পৃথিবীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। আপনারা পদ, প্রাসাদ এবং চেয়ারকে নিজেদের শাসক বানিয়ে নিয়েছেন। মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে ভয়াবহ মারণাস্ত্র ব্যবহার করেছে। মানবতার সাথে মানুষ দম্ভ করেছে,

বিদ্রোহ করেছে, যার ফলে মানুষকে মানুষের চেয়ে হাজার গুণ নিকৃষ্ট বস্তুকে নিজের শাসক বানাতে হয়েছে। যাদের মাঝে প্রাণ নেই, নড়া-চড়া নেই, কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সেই সব জিনিস মানুষের উপর চেপে বসেছে। এ এক বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় বিষয় যে, সৃষ্টির সেরা মানুষের উপর শাসন করছে তার তৈরী আইন ও নিষ্প্রাণ বস্তু।

উপকরণ লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে

এই দুনিয়ায় এমন মানুষই অধিক সংখ্যক, যাদের স্মরণ নেই যে, তাদের অবস্থান কোথায় এবং তাদের জীবন-যাপনের উদ্দেশ্য কি? যে জিনিসগুলো মানুষের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য নিছক মাধ্যম ও উপকরণ, সে সবের মাঝে এমন মেহনত ব্যয় করা হচ্ছে যেন সেটাই মূল লক্ষ্য। মূল লক্ষ্য ভুলে মানুষ অহমিকা ও আত্মবিস্মৃতির মায়াজালে আটকা পড়ে আছে। মানুষ অন্যের উপর শাসন চালাতে চায়। কিন্তু যখন অন্যের উপর কারুর বিজয় অর্জিত হয়, তখন তার উপর অন্য জিনিস শাসন চালায়। একটি জাতি কেন, একজন ব্যক্তিও শোভন মনে করে না যে, তার উপর কেউ শাসন চালাক, ক্ষমতা চর্চা করুক। পক্ষান্তরে মানুষের চেয়ে সহস্র ধাপ নীচের নিকৃষ্ট জিনিস– যেমন পোশাক, প্রাসাদ, টাকাকে আমরা আজ আমাদের শাসক বানিয়ে রেখেছি। প্রবৃত্তি, মানব রচিত আইন-কানুন আর জড় পদার্থের শাসন চলছে এখন মানুষের উপর। অথচ এ জিনিসগুলোর মাঝে কোন আকর্ষণ নেই এবং তা কখনো আমাদের উদ্দেশ্যে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আমরা জড় পদার্থকে প্রাধান্য দিয়েছি মানুষের উপর। উৎপাদিত পণ্যকে আমরা মানুষের চেয়ে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ মনে করে বসে আছি। অথচ আজ আমাদের মাঝে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রকৃত শান্তি থেকে বঞ্চিত। এর কারণ হলো, মানুষ ভুলে গেছে মনুষ্যত্ব, মানবতা। মানুষের উপর এখন প্রবল হয়ে আছে সর্বনাশা এক আত্মবিস্মৃতি।

নিশ্চয়ই আমরা ভুলে গেছি, আমাদের মূল মর্যাদা কি? আমাদের ত্রুটিপূর্ণ আচরণ ও জীবন-যাপনের কারণেই সমস্ত দুনিয়ায় এই বিক্ষিপ্ততা। আমরা ক্ষমতা ও পদের জন্য জীবন বিলিয়ে দিচ্ছি, অথচ আমরা ভুলে গেছি আমাদের প্রকৃত সম্মান এবং যথার্থ শান্তির পথ। ভূগোল কেন? যদি এই দুনিয়ায় মানুষের জন্ম না হতো, তবে-ইতিহাস ও ভূগোলের কি প্রয়োজন ছিলো? সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষের জন্যেই তো। অতঃপর একি অদ্ভুত বিষয় যে, মানুষ তার পজিশন বুঝতে পারছে না, তার প্রকৃতি ও বাস্তবতা থেকে সে প্রতি মুহূর্তে দূরে সরে যাচ্ছে। আপনার-আমার সাথে এ পৃথিবীর সম্বন্ধ কি? আমরা কেন এ জগতে

এসেছি? এ দুনিয়ায় আমরা কি এজন্য প্রেরিত হয়েছি যে, নদ-নদীর উপর ছুটে চলবো, বাতাসে উড়ে ঘুরবো আর বস্তুগত উন্নয়ন ও উন্নতিকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেবো? আমাদের জীবনের যে পোশাক, তা প্রতি মুহূর্তে ঢিলা হয়ে যাচ্ছে এবং মানবতার আঁচল হয়ে গেছে আজ ছিন্ন-ভিন্ন।

কবির ভাষায়–

আমার গোটা শরীরই ক্ষত-বিক্ষত

পট্টি আর কোথায় বাঁধবো।

আল্লাহ্‌র নির্বাচিত মানুষ– যাদের আমরা পয়গাম্বর বলে থাকি– দুনিয়ায় এ জন্যই এসেছেন যে, মানুষকে তার মর্যাদা ও তার জীবন-লক্ষ্য বাতলে দিবেন। তাঁরা একটি সহজবোধ্য নীতি বলে গেছেন, মানুষকে আল্লাহ্‌র জন্য বানানো হয়েছে আর এই সমস্ত সৃষ্টি, জীব-জন্তু ও বস্তু বানানো হয়েছে মানুষের জন্য। যদি আপনারা ও আমরা উপলব্ধি করে নিই যে, আমরা এ পৃথিবীর যামিন, সংরক্ষক ও পর্যবেক্ষক, তাহলে নিশ্চিত যে, আমাদের ও আপনাদের জীবনের ধারা ও গতি পাল্টে যাবে এবং দুনিয়ায় যে বিপর্যয় ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবল, তা অবশ্যই দূর হয়ে যাবে।

বিত্তবান হওয়ার প্রতিযোগিতা

কিন্তু যদি আপনি এটা বুঝে বসে থাকেন যে, আপনি শুধু টাকা উৎপাদনের মেশিন, তাহলে মানবতার পোশাক দিন দিন ঢিলা হতেই থাকবে। সীমাহীন সংখ্যক ও পরিমাণ অর্থ উপার্জন যখন আপনার জীবনের লক্ষ্য হয়ে যাবে, তখন অবশ্যই মানবিক সম্বন্ধকে আপনি মর্যাদা দিতে পারবেন না, কারুর হৃদয়ে দুঃখ দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার থাকবে না কোন লজ্জাবোধ। কারুর উপর জুলুম করতে গেলে অন্তরে জাগবে না ভীতি ও ত্রাস। আপনার আদর্শ যদি এই হয় যে, জীবন নিছক কোন ভোগ-বিলাস, বিত্তবান হওয়া এবং অল্প সময়ে দ্রুত অর্থ সংগ্রহের নাম, তাহলে তার ফলাফল তো এই হবে যা আজ আমাদের সামনে উপস্থিত। মানবতা খুন হয়ে গেলেও, মনুষ্যত্ব বিনাশ হলেও প্রত্যেক মানুষ বিত্তবান হওয়ার এই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সকল নৈতিক শিক্ষা-দীক্ষা আলমিরায় উঠিয়ে রাখা হয়েছে এবং প্রতিটি শহরেই একটি প্রতিযোগিতার ময়দান গরম হয়ে আছে। অফিসে অফিসে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই কেরানী চায়, তার পকেট ভরে যাক। বর্তমানে দর্শন, কাব্য আর

শিল্পকলার উদ্দেশ্যও বিত্ত ও প্রসিদ্ধি লাভ করা। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বেলায়েতের মাঝে আধ্যাত্মিকতার লক্ষ্যও এটাই রূপ নিয়েছে যে, সম্পদ ও বিত্ত অর্জিত হোক।

মুদ্রার স্বভাব

আপনি যে বস্তুকে ভালোবাসবেন, তার প্রতিবিম্ব আপনার উপর পড়বেই। টাকা-পয়সার প্রতি ভালোবাসার প্রতিবিম্বও আজ পুরোমাত্রায় মানবতার উপর পড়েছে। টাকার অবিশ্বস্ততা এবং তার বর্ণবাহুল্য আজ আমাদের মানসিকতায় ও মনে অনুপ্রবিষ্ট। সকল ধ্যান-জ্ঞান, স্বপ্ন-সাধনা এই মুদ্রার মাঝেই ডুবে আছে। আমাদের মাঝে মুদ্রার বৈশিষ্ট্য-কঠোরতা, বর্ণবাহুল্য ও অবিশ্বস্ততা পাওয়া যাচ্ছে। সমস্ত জীবনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আরো অধিক অর্থ উপার্জনের পরও আজ দুনিয়ার ভাগ্য হয় না সেই লাভ অর্জনের, যা মুদ্রার উদ্দেশ্য ছিলো। কেননা মানবিক সহানুভূতি ও সেবামূলক প্রেরণা ব্যতীত প্রশান্তির সম্পদ অর্জিত হতে পারে না। মানবতার হক বিনষ্ট করা মানবতা হত্যার নামান্তর। আদর্শের শাসন প্রতি যুগেই ছিলো। কিন্তু কোন কোন কালে মানব যিন্দেগীর আদর্শ এমনও হয়েছে যে, সম্পদ অর্জনের স্বার্থে মানুষের কোমল হৃদয়ও প্রয়োজনে মাড়িয়ে চলে যাও! মানবিক স্বভাব ও চরিত্র আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। মুদ্রার নামে আজ মানুষ হয়েছে মানুষের দুশমন।

ব্যবসায়ী ও ক্রেতা

আজ ভাই ভাইকে গ্রাহক অথবা ক্রেতার দৃষ্টিতে দেখছে। সারা দুনিয়াই এখন দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেছেঃ একদল ব্যবসায়ী, আরেক দল ক্রেতা। আজ দুনিয়ার জিদ হলো, সমগ্র জীবন এ ধরনের বাজারেই কেটে যাক। মানুষ মানুষের হৃদয়ে বাড়ি বানানো, হৃদয় আবাদ করা, হাল-পরিস্থিতি লক্ষ্য রাখা পরস্পর সম্পর্ক বজায় রাখা এবং একে অন্যের হক পালন করা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এই দুনিয়ায় যেন সমস্ত সম্পর্কই ফুরিয়ে গেছে, সমস্ত প্রেরণা শীতল হয়ে গেছে, সমস্ত ভালোবাসা উবে গেছে এবং এখন একজন ব্যবসায়ী ও অন্যজন ক্রেতারূপে জীবন কাটাতে চাচ্ছে। একজন অন্যজনের পকেটের দিকে চোখ নিবদ্ধ করে রেখেছে। এই বিত্ত-সম্পদ সন্তানের হৃদয় থেকে পিতা-মাতার ভালোবাসা উঠিয়ে দিয়েছে। শাগরিদ ও ছাত্রের হৃদয় থেকে নির্মূল করেছে গুরু ও শিক্ষকের প্রতি লালিত শ্রদ্ধা। মা-বাবার হৃদয় থেকে উৎপাটন করেছে সন্তানের স্নেহ। সমস্ত জীবনই একটি দোকানে পরিণত হয়েছে। নিঃস্বার্থ

সমবেদনা ও সেবার প্রেরণা নেস্তনাবুদ হয়ে গেছে। জীবনের প্রকৃত স্বাদই এখন উধাও। প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্যকে গ্রাহকের চোখে দেখে এবং ভাবে– কি লাভ এর কাছ থেকে উঠানো যায়। যদি দুনিয়ায় নিছক দোকানদার আর খরিদ্দারই বসবাস করে, তবে কি জীবনের স্বাদ মাটি হয়ে যাবে না?

১৯৪৭ ইং সনের পূর্বে ইংরেজদের শাসনামলে এমন শিক্ষকও পাওয়া গেছে, যিনি পড়ানোর বিল নিজে বানিয়ে দিতেন এবং এক কালেক্টর সাহেব– যার ছেলে তার কাছে এসে থেকেছিল– তার সেই ছেলের থাকার বিলও তিনি বানিয়ে দিয়েছিলেন। এখন তো এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, প্রাণ ও বাকহীন জিনিসও না আবার বিল পরিবেশন করা শুরু করে! ছায়ায় দাড়ানোর বিল বৃক্ষ নিজেই না আবার পেশ করে বসে! যমীন না আবার নিজের উপর চলার বিনিময় দাবী করে বসে! এই জীবনটা কি?

একটি হাটে পরিণত হয়েছে এ জীবন!

কিন্তু সমগ্র জীবন তো কেউ হাটে-বাজারে কাটাতে পারে না।

সম্পদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্মান

সবার আগে আমাদের দৃষ্টি যখন কারুর উপর পড়ে, তখন তার পোশাক, জীবনের মান ও আর্থিক অবস্থা আমরা পর্যবেক্ষণ করি। তার চরিত্র এবং মানবতার কোন মূল্য ও মর্যাদা আমাদের বাজারে নেই। আজ অনুসন্ধানীদের মত একটি স্বর্ণ পাহাড়ের চারপাশে মানুষ চক্রাকারে ঘুরছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি, কোন্ জিনিস আমাদেরকে জীবনের প্রকৃত আনন্দ ও পরিতৃপ্তিতে সমৃদ্ধ করবে?

পয়গাম্বরগণ মানুষকে বলেছেন, যদি তোমরা নিজেদেরকে দুনিয়ার অনুগত বানিয়ে নাও এবং নিজেদের রিপু ও প্রবৃত্তিকে নিজেদের উপর প্রবল হতে দাও, তাহলেই এই সমগ্র জীবন অস্বাভাবিক ও বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে এবং এমন স্বেচ্ছাচারিতা ছড়িয়ে পড়বে যে, এই দুনিয়াই তোমাদের জন্যে জাহান্নামে পরিণত হবে। যদি মানুষ নিজেদের না চিনে, না জানে, তবে নিজেদের মর্যাদা ও অবস্থান থেকে তারা ছিটকে পড়বে; বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হবে মানবতা ও ইনসানিয়াত।

মানবতার মর্যাদা

কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, মানুষ সৃষ্টি করে ফেরেশতাদেরকে তার সামনে অবনত করানো হয়েছে যার দ্বারা এই সবক পাওয়া যায় যে, আপন সৃষ্টিকর্তা

ব্যতীত অন্য কারুর সামনে অবনত হওয়া মানবতার জন্য এক মহা অবমাননা। আল্লাহ্‌র পর ফেরেশতাগণই অনুগত্য প্রদশর্নের সর্বাধিক উপযোগী ছিলেন। কারণ তাঁরা এই জগতের যাবতীয় কর্ম আনজাম দেন। আল্লাহ্‌র হুকুমে তারা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, বাতাস প্রবাহিত করেন। যেভাবে একজন শাসনপ্রধান তার নায়েব এবং তার কর্মচারীদের পরিচিত করেন, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌ মানুষের সামনে ফেরেশতাগণকে অবনত করিয়ে একটি পরিচিতি অথবা ইনট্রোডাকশন করালেন, যাতে কেয়ামত পর্যন্ত আগত প্রত্যেক মানব প্রজন্মের এই পাঠ স্মরণ থাকে যে, সে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারুর সামনে মাথা নত করার মতো প্রাণী নয়। কিন্তু মানুষ তার আপন অস্তিত্ব এবং সত্তাকে ভুলে গিয়ে মানবতার অবমাননা করে চলেছে, মানবতাকে খুন করে চলেছে।

মানুষের প্রকৃত শত্রু

যুদ্ধের ইতিহাসগুলো পরিষ্কার বলে দেয়, রিপু এবং উদরের আগুন নেভানো ব্যতীত অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য রাষ্ট্রগুলোর ছিলো না। কোন সাঁজোয়া গাড়ি এবং কোন বিধ্বংসী বিমান থেকে কোন শত্রু অবতরণ করেনি। বাহির থেকে কেউ অত্যাচার করার জন্য আসেনি। অন্য কোন রাষ্ট্র থেকেও কেউ আসেনি আমাদের ধ্বংস করার জন্য বরং আমাদের যা বিপদ-আপদ তা আমাদের হাতেই এসেছে এবং এগুলো আমাদেরই চারিত্রিক ও নৈতিক স্খলনের ফল।

আপনাদের আগে যেসব জাতি দুনিয়ায় ধ্বংস হয়ে গেছে কোন মহামারি কিংবা মারাত্মক ব্যধির কারণে, আমাদের উপর সেই বিনাশ আসেনি; বরং তা নিজস্ব নৈতিক বিপর্যয়, বিত্তপূজা এবং চারিত্রিক অধঃপতনের কারণে ধ্বংস হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো যেই রোগ ও ব্যধিকেই চিহ্নিত করুক; কিন্তু আমি বলছি- মূল ব্যধি হলো মানবতার বিনাশ এবং চারিত্রিক অধঃপতন।

চোখের ক্ষুধা

আমি চ্যালেঞ্জ করছি, কোন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ পারলে প্রমাণ করে দেখাক যে, উৎপাদনের চেয়ে অধিক হলো মানুষ। এটা অসম্ভব। কারণ যে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তার রিযিক ও খাদ্যও তিনি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আজ মানুষের ক্ষুধা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সে এক সের খেতে না পারলেও নিজের কাছে একমণ দেখতে চায়। চোখের এই ক্ষুধা কখনো পূরণ হতে পারে না। আজ কাল্পনিক প্রয়োজনীয়তাগুলোর তালিকা এতই দীর্ঘ হয়ে গেছে যে, তা পূরণ করা কখনো সম্ভব হতে পারে না। আমাদের প্রয়োজনগুলো পূরণের দায়িত্ব আল্লাহ্‌

নিজেই নিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ এই দায়িত্ব নিশ্চয়ই নেননি যে, আপনি চারটি মোটর হাঁকিয়ে চলবেন, সিনেমা দেখার আহলাদ করবেন আর অর্থ-বিত্ত পুঞ্জীভূত করাও আবশ্যকীয় মনে করবেন। আজ যদি মানুষের মাঝে শান্তি আসে, জীবন উন্নত ও উত্তম হয়, তবে তার পথ শুধু এটিই হতে পারে যে, মানুষকে একটি সুন্দর বিধান তালাশ করে নিতে হবে।

কোন সুপারিশের প্রয়োজন নেই ধর্মের

ধর্মের পক্ষে কোন সুপারিশের প্রয়োজন নেই। যেসব লোক ধর্মকে মজলুম রূপে পরিবেশন করে থাকে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমাদের সংকট, আমাদের অস্থিরতা আমাদের এ বিষয়ে বাধ্য করছে যে, আমরা যেন ধর্মকেই এখন আপন করে নিই। আপনি কত দিন পর্যন্ত জিদ করবেন, কত দিন পর্যন্ত মাটি ফেলে রাখবেন চোখে। শেষ পর্যন্ত আপনার এই বিস্বাদ ও তিক্ত জীবনের ধারা কত কাল পর্যন্ত ধরে রাখবেন? আজ আমি দাবীর সাথেই বলছি, কোন নিয়ম এবং নিয়ন্ত্রণ মানুষকে চরিত্রহীনতা ও অপরাধ থেকে ফিরাতে পারবে না বরং আল্লাহ্র ভয়, আল্লাহ্র ধর্মের সাথে সম্বন্ধ, মানুষের প্রতি ভালোবাসাই আমাদের ব্যাধিগুলোর একমাত্র চিকিৎসা। আজ আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই বিশাল দৈর্ঘ-প্রস্থের দেশে- যেখানে কোটি কোটি মানুষ বসবাস করে এবং অনেক বড় বড় মানুষ ও এখানে রয়েছেন, যারা আমাদের অহংকার- চারিত্রিক দুর্বলতাগুলো দূর করা এবং আত্মিক ও মানবিক জীবনকে চালু করার জন্য সেখানে কোন আন্দোলন এবং কোন সংগঠন পরিলক্ষিত হয় না।

আমরা অনেক অপেক্ষা করেছি এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, যা কিছু হওয়া সম্ভব আমাদের দিয়ে, তাই শুরু করে দেয়া হোক।

স্বাধীনতা সংরক্ষণ

আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি যে, স্বাধীনতা অর্জন করাতো ভালো কাজ। কিন্তু আমাদের চারিত্রিক অবস্থার বিশুদ্ধতা আনয়ন এবং আমাদের জীবনে মানবতার জাগরণ ব্যতীত স্বাধীনতাকে স্থিতিশীল রাখা অসম্ভব। পৃথিবীর ইতিহাস বলে, কোন দেশ এবং কোন রাষ্ট্র চারিত্রিক উন্নয়ন এবং মানবতার উপস্থিতি ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না।

আজ এ কাজে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক শ্রেণী ও স্তরের মানুষের জন্যই আবশ্যকীয়। এ কাজে আপনারা এ বিশ্বাসের সাথে সহযোগিতা করুন যে, নিঃস্বার্থ সেবার প্রেরণা, চারিত্রিক উন্নতি এবং মানবতার জাগরণ ব্যতীত আমাদের জীবনের সমস্যাগুলো কিছুতেই দূর হবে না।

ইউরোপ জীবন থেকে নিরাশ

ইউরোপ আজ দুনিয়ার ইমাম বনে আছে। ইউরোপ তার বস্তুগত উন্নতির সাথে সাথে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে যাচ্ছে এবং জীবনের প্রকৃত স্বাদ ও মূল শান্তি থেকে সে শূন্য ও বঞ্চিত। প্রাণহীন হয়ে গেছে সে অতিরিক্ত বস্তুপ্রেমের কারণে।

মুসলমানদের দায়িত্ব

মুসলমানদেরকে আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি যে, আল্লাহ্‌র একত্ববাদের উপর, তার সত্তা ও দ্বীনের উপর যে পরিমাণ দাবী আপনাদের, তার চাহিদা তো এই ছিলো যে, আপনারা দুনিয়ার বুকে এই আহবান ঘোষণার মতো ছড়িয়ে দিবেন, চেপে রাখা বাস্তবতাকে প্রকাশ করবেন, অন্য ভাইদেরকে এই ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণ করিয়ে দিবেন। কিন্তু আপনারা তো এর চিন্তাও করেননি। অন্য দেশের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ছেড়ে দিন। আপনাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাসে চোখ বুলিয়ে দেখুন যে, স্পেনে অবতরণ করার পর তারেক (র.) যখন তাঁর জাহাজগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিলেন, তখন তাঁকে এ অগ্নিসংযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি তলোয়ারে হাত রেখে জবাব দিলেন, যেই ভীতুরা জাহাজকে তাদের প্রভু বানিয়ে বসেছিলো, তারা নিরাশ হয়ে যাক। কিন্তু আমাদের প্রভু তো একমাত্র আল্লাহ্– যিনি চিরঞ্জীব, চির প্রতিষ্ঠিত; আমরা তাঁরই পয়গাম নিয়ে এসেছি। এখন আমাদেরকে এই দেশে বাঁচতে ও মরতে হবে। আপনারা এই দেশে তাওহীদের উপহার বিতরণ করতে পারেন এবং এই উপহার তো গ্রহণেরই উপযোগী। আমি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা এই দেশেই থাকার সিদ্ধান্ত করে নিন। কেউ মানুক আর না মানুক, আপনারা এই প্রয়োজনটা উপলব্ধি করুন।●

আপন স্থানচ্যুত হয়ে গেছে সব

এই দেশের সংশোধন সে সময় পর্যন্ত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিঃস্বার্থ সেবা, সঠিক আবেগ, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও মানবিক সহমর্মিতাবোধের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। মানুষের জীবনের মূল মর্যাদা এবং প্রকৃত লক্ষ্য হলো আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলীফা হওয়া। কিন্তু আপনারা মুদ্রার পদতলে নিজেদের মস্তক ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন। আপনারা মুদ্রাকে পকেটে জায়গা দেয়ার পরিবর্তে নিজেদের হৃদয়ে-মস্তিষ্কে জায়গা দিয়ে রেখেছেন। বাড়িতে বাড়িতে যে মসজিদ ও মন্দির বানানো হয়েছে, এগুলো তো টাকার মসজিদ ও মন্দির; যেখানে টাকার পূজা চলছে। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি এবং সত্যপ্রেমী হয়ে যান, এই জীবনের অবস্থান ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা আপনাদের সঠিক স্থানে আসুন, অন্য সবকিছু স্বস্থানে ফিরে আসবে।

● ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব ও অধিকারের সুদূর প্রসারী দরদ এখানে ব্যক্ত হয়েছে। –অনুবাদক

লড়াই ভালো মন্দের নয়
লড়াই চলছে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার

(১৯৪৫ ইং সনের জানুয়ারীর ২৪ তারিখ রবিবার ভারতের শিল্পনগরী আজমগড়ে ভাষণটি প্রদান করা হয়। নগরীর হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মতবাদপন্থী লোকজন ভাষণটির শ্রোতা ছিলেন)।

হিম্মতভাঙা অভিজ্ঞতা

বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে যে সব বিভক্তির সৃষ্টি হচ্ছে, তা অবশ্যই নির্দয় ও মর্মান্তিক। প্রথম দিকে জাতি-গোষ্ঠী এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রকে বিভক্ত করেছে। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো বিভিন্ন জাতি ও অঞ্চলের মাঝে বিভক্তি তৈরী করে চলেছে। আজকের সভ্য পৃথিবী ও গণতান্ত্রিক যুগে যেমন অস্থিরতা ও বিপর্যয় পরিলক্ষিত হচ্ছে ধর্মের আবরণে, অতীতে কখনো এমনটি দেখা যায়নি। আজকের রাজনৈতিক প্লাটফরমগুলো জনসাধারণকে বিচ্ছিন্ন করা, বিভক্ত করা এবং নিজেদের গ্রুপ স্ফীত করার লক্ষ্যেই সক্রিয়। অন্য কারো লাভ-ক্ষতি, উত্থান-পতনে তাদের কিছুই যায় আসে না। অবশ্য যদি নিঃস্বার্থভাবে আহবান করা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ এখনও সাড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত। রাজনৈতিক প্লাটফরম ব্যতীত লোকজনের একত্রিত হওয়া আজও সম্ভব। তাই আমরা সম্পূর্ণ মানবীয় সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তা করতে আহবান জানাচ্ছি।

আমাদের হৃদয় বড়ই আনন্দিত যে, আপনারা এতে সাড়া দিচ্ছেন। রাজনৈতিক তৎপরতার প্রতি আপনাদের যে শংকা তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। মানুষতো তার অভিজ্ঞতা থেকেই ফল গ্রহণ করে। বারবার যে ব্যাপারগুলো সে ঘটতে দেখে, সেগুলোকেই সে নিয়ম বানিয়ে নেয়। বর্তমানে স্বার্থকে উপলক্ষ্য করে লোকজন জমায়েত করার রেওয়াজ হয়ে গেছে। আমাদের উপর আপনারা আস্থা রাখতে পারেন। আমরা কোন পার্টির মাউথপিস নই। আমাদের কাছে মুখ্য হলো নিখাঁদ মানবিক বিষয়াবলী।

আমাদের নেতৃত্বে হওয়া উচিত

আজকের মানুষ মৌলিক ত্রুটির উপর থেকে দৃষ্টি বন্ধ রেখে বলছে, যা কিছু হচ্ছে সব যথার্থই হচ্ছে, কিন্তু এগুলো আমার ব্যবস্থাপনায় ও কর্তৃত্বে হওয়া উচিত। যা কিছু হবে এবং ঘটবে তা আমার পর্যবেক্ষণ ও কর্তৃত্বের অধীনে হতে হবে। চরিত্রহীনতা, অমানবিকতা, চোরাকারবার ও সম্পদ কুক্ষিগত করার মানসিকতা সবই ঠিক আছে। কোন সমস্যা নেই। তবে এসবের দায়িত্ব (Trusteeship) আমাদের উপর অর্পিত হলে আরো উত্তম হতো।

আজ সবারই মনোভাব এরকম। যখনই কারো হাতে ক্ষমতা এসেছে, ঘুরে ফিরে তখন সেই পূর্বাবস্থাই সে অক্ষুণ্ন রেখেছে। সামান্য সংযোজন ও সংকোচনের পর ব্যাপারটা সেখানেই রয়ে গেছে, যেখানে ইতিপূর্বে ছিলো। বাস্তব সংকট ও ত্রুটি উপলব্ধির ক্ষেত্রে পার্টিগুলোর মাঝে মৌলিক তেমন কোন তারতম্য নেই। কেউ বলছে না, যা কিছু হচ্ছে বা ঘটছে তা হওয়া অনুচিত; বরং সকলেরই বক্তব্য হলো, যা হচ্ছে তা আমাদের অধীনে এবং আমাদেরই কর্তৃত্বে হওয়া উচিত। কারখানা ভুলভাবে চলছে, এ বিষয়ে যেন কারুর কোন আপত্তি নেই বরং আমাদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ছায়া এই সব চলমান বিষয়াবলীর মাথার উপর নেই কেন– মূলত এ প্রশ্নটিই ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইউরোপ ও এশিয়ায় একই প্রবণতা

দুনিয়ার বৃহত্তম যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছে এমনই মানসিকতার কারণে। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানী, রুশ এবং আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রের প্রত্যেকেই এই একই মনোভাব নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মিষ্টি শব্দের আড়ালে এরা একথাই বলতে চায় যে, উপনিবেশের (Colonies) ব্যবস্থাপনা অন্যদের কাঁধে অর্পণ করা কেন? অন্য জাতি-গোষ্ঠীগুলোই কেন সবসময় এ ক্ষেত্রে কর্তৃত্ববান থাকবে? মানবতার দরদে অস্থির হয়ে এরা কেউ উঠে দাঁড়ায়নি। এদের কেউই হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.)-এর প্রবর্তিত ধর্ম চালু করা, পৃথিবীতে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্যায়-অপরাধ, বেলেল্লাপনা, বিলাসিতা, অবিচার ও স্বেচ্ছাচারিতা নির্মূল করার লক্ষ্যে দাঁড়ায়নি। ইংরেজ, রুশ, জার্মানী এবং আমেরিকা কারুরই ছিল না সৎ মানসিকতা। ভালো-মন্দ, জুলুম-ইনসাফ এবং সত্য-মিথ্যাকে কেন্দ্র করে তাদের মাঝে কোন বিতর্ক ছিলো না। তাদের মাঝে বিন্দুমাত্রও এমন ভাবনার উদ্রেক হয়নি যে, আমরা পৃথিবীকে একটি নতুন

জীবনব্যবস্থা উপহার দেবো এবং মানবতার সেবা করবো; বরং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো এই যে, আমরা সোনা-চাঁদির গঙ্গা বইয়ে দেবো এবং রাষ্ট্রগুলোর স্তূপীকৃত সম্পদ ও বিত্ত থেকে ফায়দা লুটে নেবো।

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে তারা তাদের ইজারাদারী (Monopoly) প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলো। বস্তুত এরা সকলেই একটি জীবন ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলো। সেটি ছিলো এই যে, সমগ্র পৃথিবীকে পদানত করে মানুষের লাশের উপর আমরা আমোদ-প্রমোদের আসর বসাবো এবং মানবতার গোরস্থানে নির্মাণ করবো নিজেদের প্রাচুর্য ও আড়ম্বরের প্রাসাদ। এরাতো সংযমী ছিলো না। এরা ছিলো সম্পদের ভুখা, রিপুর দাস, মদ্যপ, জুয়াড়ী, খোদাবিস্মৃত আর বিশুদ্ধ মানবিক স্বভাব ও রুচির বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী। এরা ছিলো দয়া-মায়াহীন ও মানবতার প্রেম-শূন্য। এদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজ জাতি ও রাষ্ট্র, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী, রাজনৈতিক পার্টি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয়তা কেন্দ্রিক প্রশাসন চলছে। সকলেরই মনোভাব হলো, আমরা এবং আমাদের সুহৃদ, বন্ধু, সহচররাই স্ফূর্তি করবো।

বিরাজমান দুরবস্থাকে তারা বরণ (Accept) করে নিচ্ছে। পরিস্থিতির প্রতি তাদের কোন মতবিরোধ প্রকাশ পাচ্ছে না। তাদের বিরোধিতা শুধু সেই সব ব্যক্তিবর্গের সাথে, যাদের হাতে ক্ষমতার বাগডোর। তারা পৃথিবীটাকে পাল্টাতে চায় না; শুধু বদলাতে চায় পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব-কর্তৃত্ব (Leadership)। তাদের সাধনা ও প্রচেষ্টা শুধু এটাই যে, অন্যদের স্থানে আমরা কিভাবে আসতে পারি। আপনাদের এখানে স্থানীয় নির্বাচন হয়। জেলাবোর্ড, পৌরসভা, নগরের অন্যান্য আরো কতগুলো ক্ষেত্রে নতুন নতুন নির্বাচনে নতুন নতুন লোকজন এসে থাকে। কিন্তু নতুন কোন মনোভাব, নতুন কোন জীবনবোধ, মানব সেবার নতুন কোন পদ্ধতি এবং সংস্কার-সংশোধনের নতুন কোন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কি কেউ আসে? কোন নতুন বোর্ড, নতুন কমিটি কি চরিত্রহীনতার ও লাম্পট্যের গতিরোধ করে থাকে? মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা করে?

আমরা তো জানি যে, এরা সবাই একই রকম মানসিকতা, একই রকম জীবনবোধ এবং একই রকম আবেগ-অনুভূতি নিয়ে এসে থাকে। এরই ফলে অবস্থার কোন রদবদল হয় না। রদবদল হয় কর্তৃত্ব-নেতৃত্বের, পরিবর্তন ঘটে ব্যক্তি-মানুষের। জীবনের স্খলন ও সমাজের অবক্ষয় যতটুকু ছিলো ততটুকুই থেকে যায়।

পয়গাম্বরের আহবান

এসবের বিপরীতে পয়গাম্বরগণ বলেন, গোড়া থেকেই জীবনের কাঠামো ত্রুটিপূর্ণ ও গলদ অবস্থায় আছে। এই কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে আবার নির্মাণ করো। তাতে আবারো রঙের প্রলেপ দাও। এর উদাহরণ মূলত এরকম যে, কেউ একটি শেরোয়ানী সেলাই করিয়ে আনলো। পরে দেখা গেলো, সেই শেরোয়ানী তার গায়ে ঠিকমত ফিট হচ্ছে না। তখন সে শেরোয়ানীর এদিক-ওদিক কাটা শুরু করেছে, শুরু করেছে টানাটানি। এ পরিস্থিতিতে পয়গাম্বরগণ বলেন- সামান্য টানাটানি আর কাটাকাটি করে কোন সমাধান হবে না বরং শেরোয়ানীর প্রধান সেলাইকৃত কাঠামোটাই ত্রুটিপূর্ণ। যতক্ষণ এই কাঠামো অক্ষুণ্ন থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শেরোয়ানীটি ঢিলেঢালা, অসামঞ্জস্যপূর্ণই থেকে যাবে। তাই এই কাঠামো পাল্টিয়ে গোড়া থেকে আবার শুরু করো।

জনসাধারণের প্রতি উৎকোচ

গোটা পৃথিবী আজ স্ব-স্ব চাহিদা ও জৈবিক তাড়নার ক্ষেত্রে জনসাধারণকে স্বাধীনরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। ভুল ও ক্ষতিকর চাহিদার বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে আজ সকল দল ও সংগঠন তাদেরকে উৎকোচ দিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে দিচ্ছে প্রবৃত্তির উৎকোচ, চরিত্র ও নৈতিকতাহীনতার উৎকোচ। একজন অন্যজনের চেয়ে আগে বেড়ে গিয়ে বলছে, আমাদের হাতে কর্তৃত্ব এসে গেলে আমরা তোমাদের চাহিদা পূরণ করবো এবং ভোগ বিলাস ও উন্নতির পূর্ণ সুযোগ করে দেবো। যদি নিজেদের প্রবৃত্তির পূরণ এবং যথেচ্ছ স্বাধীনতা পেতে চাও, তবে আমাদের ভোট দাও। আজ প্রত্যেকেই এই কথা বলছে যে, আমরা ক্ষমতা পেয়ে তোমাদের বিলাসিতা বৃদ্ধি করবো, তোমাদের জীবনের মান উন্নত করবো। যেন তারা মিষ্টি বিতরণ করে শিশুদের স্বভাব নষ্ট করে দিচ্ছে। জনসাধারণকে তারা মিষ্টির পিছনে লাগিয়ে দিয়েছে। যেন পৃথিবীর মানুষেরা সব শিশু! পার্টিগুলো তাদের সামনে রিপুর বাতাস প্রবাহিত করছে। নষ্ট করছে মানুষের অভ্যাস।

মানুষের অবস্থা হলো এই যে, যতই তাদের দেয়া হবে ততই তাদের দাবী বাড়বে। ফিল্ম আসছে। তাদের বিকৃত তাড়না আরো বাড়ছে। এখন তারা আরো অধিক উত্তেজনা (EXCITEMENT), আরো মারাত্মক নগ্ন ছবি চাচ্ছে। এই পৃথিবীর কর্তা ব্যক্তিরা মানবীয় চাহিদা ও রিপুর উপর কোন লাগাম লাগাতে প্রস্তুত নন বরং তাদেরকে তাদের বিকৃত রুচির উপর ছেড়ে দেয়া হচ্ছে।

এমনটি নয় পয়গাম্বরগণের পথ। তাঁরা চাহিদার মাঝে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেন। তাঁরা বলেন– মানুষের সকল চাহিদা পূরণের প্রয়াস প্রকৃতিবিরুদ্ধ; অস্বাভাবিক। পয়গাম্বরগণ বলেন– মানুষের এই তাড়না ভয়ঙ্কর। এটা দূর করা উচিত। শিশুর মন খারাপ হোক। কিছু সময় সে কাঁদুক, বিরক্ত করুক। এসব সহ্য করেই তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। এ-তো এক ভুল দর্শন যে, রিপুর গতি বন্ধনহীন রাখা হবে, তার সুযোগ অক্ষুণ্ন থাকবে আর যখন তার দ্বারা অনিষ্ট প্রকাশ পেতে থাকবে, তখন বিস্ময় নিয়ে তা প্রত্যক্ষ করা হবে এবং অভিযোগ পেশ করা হতে থাকবে।

রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর নীতিমালা হলো, এ জীবন-ধারা গ্রহণ করে নেওয়া হোক। তাদের নীতিমালা ভুল। লাগামহীন ও বিপথগামী ঘোড়া মানবতার শ্যামল উদ্যান মাড়িয়ে ধ্বংস করছে। সব ক'টি সংগঠনই আজ সেই লাগামহীন ঘোড়ার চরিত্র গ্রহণ করেছে। তাদের আচার-আচরণ পরিণত হয়েছে লাগামহীন ঘোড়ার মাত্রাহীন রেসে। মানবিক হৃদয়ের কোন মূল্য কি তাদের সামনে আছে? আছে মানবিক সহানুভূতির কোন প্রেরণা? ইউরোপ, আমেরিকা তো সাম্য ও সহানুভূতির কথা উচ্চারণ করে। কিন্তু তাদের সহানুভূতির ধরন আমাদের সকলের জানা আছে। বাইরে বাইরে সহানুভূতি ঠিকই প্রকাশ করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওদের মাঝেও সেই জিঘাংসার ভূত বাসা বেঁধে আছে। ওদের অত্যাচারের পদ্ধতিটি সাংঘাতিক বিস্ময়কর ও অদ্ভুত।

রাষ্ট্র এবং পদের অধিকারী কে?

আমরা বলি– জীবনের পথ তার গন্তব্য থেকে দূরে সরে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার প্রতি বিশ্বাস না জন্ম নিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধন সম্ভব হবে না। এই পন্থা ব্যতীত আমরা অত্যাচারীকে সংযত, সতর্ক ও সহানুভূতিশীল বানাতে পারবো না। রেকর্ডারের মতো মুখস্থ কথা আওড়ানোর জন্য আমি আপনাদের মুখোমুখি হইনি। প্রয়োজনীয় পড়াশোনার পর বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি বিশ্বাস জন্মাবেন ও একীন পয়দা করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মানবতার মূল কাঠামোয় পৌছতে পারবেন না। মানুষের অন্তর থেকে সম্মান ও পদের মোহ, বিত্তের লালসা দূর করুন এবং ত্যাগ, বিসর্জন ও অন্যের জন্য বিলীন হওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করুন! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন– তার জন্যই পদ; যে পদের প্রার্থী না হয়। তখন মানদণ্ড ও যোগ্যতা (QUALIFILATION) এমনই ছিল। পক্ষান্তরে আজকে নির্লজ্জভাবে নিজেই নিজের বন্দনা গেয়ে ক্ষমতা অর্জন করা হয়। সাহাবায়ে

কেরাম ক্ষমতা থেকে নিরাপদ দূরে পালিয়ে থাকতেন। হযরত উমর (রা.) ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন, যাতে তাঁকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থেকে রেহাই দেয়া হয়। তাঁকে বাধ্য করা হতো এই কথা বলে যে, আপনি যদি হাত গুটিয়ে নেন, তাহলে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে কে? যতক্ষণ পর্যন্ত সে দায়িত্বে তাঁরা থাকতেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটাকে কঠিন দায়িত্ব ও মারাত্মক বোঝা মনে করতেন। ক্ষমতা পরিচালনা থেকে রেহাই পেলে হৃদয়ে অনুভব করতেন প্রশান্তি। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.)কে প্রধান সেনাপতি বানানো হয়েছিলো। চতুর্দিকে তাঁর নাম ডাক ছড়িয়ে পড়েছিলো। যুদ্ধ চলাকালে একটি সামান্য চিরকুট এলো মদীনা থেকে। চিরকুটটিতে লেখা ছিলো– খালেদকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে এবং তাঁর স্থানে আবু উবায়দাহ্ (রা.)কে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এতে তিনি বিন্দুমাত্রও সংকুচিত না হয়ে দারুণ প্রসন্ন মনে ঘোষণা করলেন– জিহাদের এই কর্মটিকে যদি আমি ইবাদত ও ফরয মনে করে থাকি, তাহলে এখনো তাই করবো, আর যদি উমর (রা.)-এর জন্য জিহাদ করে থাকি, তাহলে সরে যাবো। এর পর মানুষ দেখলো যে, তিনি সেই পূর্বের উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়েই যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। তাঁর আচার-আচরণে কোন পরিবর্তন প্রকাশ পেলো না।

মর্যাদা লিপ্সু রাজনীতি

এখন রাজনৈতিক সংগঠন থেকে কাউকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে প্রথম দিকে সে বের হয়ে যাওয়ার নামটিও নেয় না, চুপচাপ থাকে। এরপর ঝামেলা বাঁধায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর অন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী করে। এর কারণ কি? কারণ হলো, মর্যাদার লিপ্সা, বিত্তের লোভ এবং অহংকারী মনোভাব মন-মানসে ছেয়ে আছে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত বিরাজমান জীবনের ধারা না বদল হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধন দুষ্কর। আপনাদের কাছে আমি পরিষ্কার ভাষায় জীবনের বাস্তবতা বলছি– আল্লাহর ভয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রেরণা সৃষ্টি করুন, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের জন্ম দিন; জীবন যাপনে তৃপ্তি লাভ করা এবং জীবনটাকে ভোগ (ENJOY) করার চিন্তা-ভাবনা ও পদ্ধতি– যা এখানে জীবনের আদর্শে (IDEAL) পরিণত হতে চলেছে– তা বর্জন করুন।

মানবীয় প্রয়োজনের তালিকা দীর্ঘ নয়

মানবীয় প্রয়োজনের তালিকা খুব দীর্ঘ নয়। অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসের (LUXURIES) তালিকা অবশ্য বেশ দীর্ঘ। সকলের জীবনের ভিত্তি নির্মিত হয়েছে এ তত্ত্বের উপর যে, জীবনকে ভোগ করাই লক্ষ্য বানিয়ে নাও। উদর ও

প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো। খোদাকে মেনো না, তার সর্বময় কর্তৃত্ব অস্বীকার করো। মানুষকে একটি উন্নত জন্তু মনে করো এবং অধিক থেকে অধিকতর প্রবৃত্তিজাত চাহিদা পূরণ করে যাও।

যা কিছু হচ্ছে এসব তো এরই বিষফল। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভিত্তি অক্ষুণ্ন থাকবে, হাজারো প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধন অসম্ভব। কোন শহর অথবা রাষ্ট্রের কথা দূরে থাক, কোন একটি পৌরসভার একটি ক্ষুদ্র মহল্লারও সংশোধন সম্ভব হবে না। মন্দ একক ও খণ্ড দিয়ে ভালো সমষ্টি হয় না।

আজ জাতির প্রতিটি সদস্য এবং সমাজের প্রতিটি অংশ বিকল ও অসম্পূর্ণ। ভুল ভিত্তির উপর এদের উত্থান হয়েছে। ভুল পদ্ধতিতে এদের প্রতিপালন ও বৃদ্ধি ঘটেছে। ফল এই হয়েছে যে, আজ গোটা মানব সমষ্টি বিকল, অপূর্ণ ও দুর্বল হয়ে আছে। দলতো একক থেকেই তৈরী হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এককভাবে প্রতিটি মানুষ সুস্থ ও সৎ না হয়, সমষ্টি ও সমষ্টিগত কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত কিভাবে সঠিক হতে পারে? ব্যক্তির প্রশ্ন উঠালে লোকজন ফুঁসে উঠে, অসন্তুষ্ট হয় এবং এ বিষয়টিকে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়।

অনেকেই আজ এই অন্তঃসার-শূন্য ধারণায় ডুবে আছে যে, সম্মিলিত অবস্থানে এলে এই অপূর্ণতা আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে। অবাক কাণ্ড তো! যখন ব্রিকফিল্ড থেকে ইট বের করছেন, তখন কেউ একজন বললো যে, এই ইটটি নষ্ট, এটি ভাঙা উচিত নয়, এগুলো তো দেয়ালের ভার সামলাতে পারবে না।' তখন এর উত্তরে আপনি বলছেন– আরে ভবনটা আগে হতে দাও! ইটগুলো আপনা থেকেই ভালো হয়ে যাবে।' কিন্তু নষ্ট ও অপূর্ণ অংশ দিয়ে একটি ভালো সমষ্টি কিভাবে তৈরী হতে পারে? বহু অসৎ অংশ ও সদস্য নিয়ে একটি ভালো বডি কিভাবে গঠিত হতে পারে? নষ্ট কাঠ দিয়ে একটি ভালো জাহাজ কি করে তৈরী হতে পারে? আমরা বলছি ইউনিট (UNITS) নষ্ট, উপাদান (MATERIAL) নষ্ট। এর দ্বারা ভালো গভর্ণমেন্ট কিভাবে তৈরী হবে? অথচ সারা দুনিয়ায় আজ এটাই হচ্ছে। উপাদান দেখছে না কেউ। অথচ ফলাফল দেখে আঁৎকে উঠছে। কিন্তু এটাতো উপলব্ধির কথা নয়। পয়গাম্বরগণ কাঠ তৈরী করেন, ইউনিট প্রস্তুত করেন। ফলে তাঁদের নির্মাণ স্থায়ী, সঠিক ও প্রাণময় হয়ে উঠে। সেখানে প্রতারণা হয় না।

আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এই বাস্তবতাকে দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। একীন ও আখলাক, বিশ্বাস ও নৈতিকতা জন্মানোর প্রচেষ্টা কোথাও করা হচ্ছে না। কোথাও নেই ব্যক্তিজীবন গঠনের ব্যবস্থা। সবখানেই তারবিয়্যাতমুক্ত

ও যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ-শূন্য জনতার ঢল নেমে আসছে। আজকের ছাত্ররা সবকিছুই করতে পারে। আর এটা এজন্য যে, তাদেরকে জীবন গঠনের কোন তারবিয়্যাত দেয়া হয়নি। মিউনিসিপ্যালটিতে কারা থাকে? জেলাবোর্ডে কারা? ক্ষমতার কর্তাব্যক্তিরাই বা কারা? একই ধাঁচের মানুষ গোটা প্রশাসনে জেঁকে বসে আছে। তাদের হাতেই জীবনের বাগডোর। আজ অধিকাংশ মানুষই মানুষ নয়, মানুষসদৃশ।

বাস্তবতা প্রকাশ পাবেই

বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েই থাকে; তার উপর যতো রঙই চড়ানো হোক। গাধা বাঘের চামড়া পরে নিয়েছিলো। কিন্তু যখন বিপদ সামনে এসেছে, অমনি নিজের কণ্ঠের ডাক ছেড়ে দিয়েছে। আজ সবখানে এটাই হচ্ছে। ভিতরের বস্তু বাইরে বেরিয়ে আসছে। আপনাদের মাঝ থেকে বহু ভাই অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। আপনাদের মাঝে অনেক নিষ্ঠাবান (SINCERE) মানুষ আছেন। কিন্তু কখনো কি আপনারা গোড়া থেকে সংশোধন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন? লোকজন সংগঠনের ক্ষমতা লাভের পিছনে ধাওয়া করছে। কিন্তু করণীয় কাজটিতো ছিলো মনুষ্যত্বের মর্যাদা সৃষ্টি করা, আল্লাহ্‌র ভয় জন্ম দেয়া।

আল্লাহ্‌র বসতি দোকান নয়

আল্লাহ্‌প্রদত্ত এই জনবসতিকে দোকান মনে করা হচ্ছে। প্রত্যেকেই অন্যজনকে গ্রাহক মনে করে আচরণ করছে। এই বেনিয়াসুলভ মানসিকতা ধ্বংসাত্মক। সবদিকেই আজ শুধু নেয়াই নেয়া। কোথাও ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে দ্বন্দ্ব, কোথাও শ্রমিক ও কারখানা মালিকের লড়াই। কিন্তু এগুলো কেন? এসব কিছুই মূলত বেনিয়া সুলভ মানসিকতার ফসল।

পয়গাম্বরগণ বলেন, প্রত্যেকেরই– একের উপর অন্যের হক আছে। সকলেরই কিছু দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট এবং হক আদায়ে আমাদেরকে হতে হবে অকৃপণ হৃদয়ের অধিকারী। আমরা বলছি– আপনারা যদি এই পন্থা অনুসরণ করে কাজ করেন, তাহলে পরিবেশ পাল্টে যাবে। জীবনে শান্তি আসবে। লুটতরাজের বাজার আজ উত্তপ্ত। সকলেরই দৃষ্টি শোষণের দিকে ধাবিত; মানুষের অপারকতা-অক্ষমতার প্রতি নজর নেই কারুর।

আমাদের পয়গাম

আমরা আমাদের পয়গামকে প্রতিটি সংগঠনের জন্য জরুরী মনে করি। আমাদের অস্তিত্ব প্রতিটি সংগঠনের চেয়ে অধিকতর প্রয়োজনীয়। কেননা

আমাদের কাজ সম্পাদন হলে মানবতার জন্য সুরভিত পুষ্পস্তবক রচিত হবে। আজ ফুল নয়, কাঁটার জন্ম হচ্ছে। নেই হয়ে যাচ্ছে মানুষ। আমরা বলতে এসেছি– মানবতার বসন্ত আনুন। মানবতার অবক্ষয়িত কাঠামোকে আপনারা আরো পরিচ্ছন্ন করুন। আজ মানবতার বৃক্ষে ধরেছে কাঁটা, ধরেছে তিক্ত ও বিষাক্ত ফল। আমরা আপনাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে আসিনি। শুধু বলতে এসেছি, আপনারা ইনসানিয়্যাতের খবর নিন। এই বিপথগামী পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্যই আমরা এসেছি। হায়! যদি সবার মাঝেই এই মর্মযাতনার জন্ম হতো। এটা পয়গাম্বরগণের কাজ এবং তাঁদেরই পয়গাম। আমরা তা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি। কেউ মাথা পর্যন্ত আটকে থাকে, কেউ পেট পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং কেউ পোষাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থানে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ধর্ম হৃদয়ে অবতরণ করে– আল্লাহ্‌র প্রতি একীন ও মুহাব্বতের সাথে, খোদার বিশ্বাস ও তার প্রেমের সাথে। ধর্ম চোখের জ্বালা ও যন্ত্রণা বিদূরিত করে। চোখের কাঁটা বের করা পয়গাম্বরগণের কাজ। তাঁদের অক্লান্ত সাধনার ফলেই অগণিত মানুষের হৃদয়ের জঞ্জাল বের হয়ে গেছে এবং অন্তরে এসেছে প্রশান্তি।

আমরা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলছি– আপনারা পয়গাম্বরগণের কাজ ও পয়গামের প্রতি ভীষণ অমর্যাদা প্রকাশ করেছেন। আপনারা অপরাধী, প্রকৃত পুঁজি ছেড়ে দিয়ে নিকৃষ্ট পুঁজিপতিদের এজেন্টে পরিণত হয়েছেন। বেনিয়াসুলভ মানসিকতা ধারণ করেছেন এবং ব্যাপারী বনে গেছেন। অথচ আপনাদের পরিচয় তো ব্যাপারী আর চাকরিজীবীর ছিলো না। এতদঞ্চলে আপনাদের আগমন ঘটেছিলো সত্যের পথে আহ্‌বানকারী দা-ঈ ও নকীবের পরিচয়ে। কিন্তু আপনারা আজ দা-ঈসুলভ মর্যাদা এবং এখানে আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য ভুলে বসেছেন। আপনারা দা'ওয়াত ও মুহাব্বত এবং আহ্‌বান ও প্রেমের পয়গাম নিয়ে জীবন কাটালে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতেন এবং সফল ও সার্থকভাবে বেঁচে থাকতেন।

এখন আপনাদের সাফল্য এরই মাঝে যে, আপনারা আপনাদের হারিয়ে যাওয়া মর্যাদা উদ্ধার করবেন। দুনিয়ার সফলতাও এর মাঝে যে, দুনিয়া পয়গাম্বরগণের পয়গামের মর্যাদা দিবে। রাজনৈতিক পার্টি ও বিভিন্ন দল–গোষ্ঠীর প্রতি অনুরোধ, নেতৃত্বের লড়াই এবং প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব বর্জন করুন। জীবনের এই বিধ্বস্ত কাঠামোটাকে আবার গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান এবং নিজ পরিবার ও বন্ধু-সহচরদের পরিবর্তে সমগ্র মানবতার চিন্তা করুন। সকলের কথা ভাবুন। সাধারণ মানুষের সংশোধন ও পরিশুদ্ধি ব্যতীত কারো পক্ষেই প্রশান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন সম্ভব নয়।

চারিত্রিক মূল্যবোধ হৃদয়ে না থাকলে বাইরের অনুসন্ধান নিষ্ফল

[ভারতের গোরখপুর টাউন হলে ১৯৫৪ ইং সনের ২৭ জানুয়ারী রাতে ভাষণটি প্রদান করা হয়। ভাষণটির শ্রোতা ছিলেন শহরের শিক্ষিত মুসলমান সহ বিভিন্ন ধর্মের মানুষ]

একটি গল্প

শৈশবে একটি গল্প শুনেছিলাম। গল্পটি হলো, একবার এক ভদ্রলোক রাস্তায় কিছু একটা খুঁজছিলেন। লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করলো- জনাব! আপনি কি কিছু তালাশ করছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'পকেট থেকে কিছু আশরাফী (স্বর্ণমুদ্রা) পড়ে গেছে, সেগুলোই তালাশ করছি।' কয়েকজন সুহৃদ তাকে সহযোগিতা করার ইচ্ছা নিয়ে তার সঙ্গে আশরাফী অনুসন্ধানে লেগে গেলো। কিছুক্ষণ পর একজন জিজ্ঞাসা করলো, 'জনাব! আশরাফীগুলো কোথায় পড়েছিলো'? তখন ভদ্রলোক উত্তরে বললেন- 'সেগুলো তো পড়েছিলো ঘরের ভিতরেই, কিন্তু মুশকিল হলো যে, ঘরে আলো নেই। রাস্তায় আলো আছে তো, তাই ঘরের পরিবর্তে রাস্তায় খুঁজছি।'

মানুষের আরামপ্রিয়তা

বাহ্যত এ কাহিনীটাকে একটি কাহিনী কিংবা কৌতুক মনে হতে পারে। কিন্তু ঘটনাবহুল পৃথিবীর দিকে তাকালে এমনটিই দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে যে, যে বস্তু ঘরে হারিয়েছে তার সন্ধান চলছে বাইরে। গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে আজ এমনটিই হচ্ছে। ঘরের জিনিস খোঁজা হচ্ছে বাইরে। কোন বস্তু হারিয়েছে নিজের অভ্যন্তরে, কিন্তু তালাশ হচ্ছে তার বাইরে। যুক্তি হলো, বাইরে আলো আছে, ঘরে আলো নেই; ভিতরে অন্ধকার। তাই বাইরে খোঁজ করাই সহজসাধ্য। বিপরীত পন্থায় এরকম বহু কিছুর অনুসন্ধান আজ হচ্ছে বিভিন্ন কমিটি ও জলসায়। প্রশান্তি, নিরাপত্তা, প্রসন্নতা ভিতরের বস্তু। কিন্তু এগুলোর অনুসন্ধান চলছে

বাইরে। মানবতার ভাগ্য অভ্যন্তরীণভাবেই বিড়ম্বনার শিকার। কিন্তু তা পূনর্গঠনের প্রচেষ্টা চলছে বাইরে। যেই নিরাপত্তাবোধ, প্রশান্তি ও চিত্ত প্রসন্নতার প্রয়োজন আমাদের, যে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও নৈতিকতার প্রয়োজন আমাদের ও আপনাদের এবং জীবনের যেই মূল্যবান পুঁজি আজ নিখোঁজ হয়ে আছে, এর সব কিছুই হারিয়েছে আমাদের হৃদয়ের রাজ্যে। হৃদয়ের ভিতরে আজ অন্ধকার। সেখানে আমাদের পদচারণা নেই। এ কারণেই এগুলোর অনুসন্ধান করছি আমরা বাইরে। আমরা নিজেদের উপর যে বড় অবিচারটি করেছি সেটি হচ্ছে এই যে, প্রথমে আমরা হৃদয়ে প্রবেশের পথ হারিয়ে ফেলেছি এবং আজ সেই হৃদয়ের জিনিসগুলোও খোঁজ করছি বাইরে। আজকের পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এ নাটকই মঞ্চস্থ হচ্ছে। অন্তর রাজ্যে অন্ধকার; বহু কাল যাবৎ সেখানে ঘোর অমানিশা। হাতে হাতে এই অমানিশা দূর হয় না। মানবীয় স্বভাব হলো আরামপ্রিয়তা। মানুষ কখনো অন্তরের ভিতরে ডুব দিয়ে হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান বস্তুটি তালাশ করে বের করে আনার মতো যাতনা সহ্য করতে চায়নি। বাইরের আলোয় নিজের হারানো বস্তুটির অনুসন্ধানকে মানুষ সহজ মনে করে থাকে। আজ জাতি–গোষ্ঠী ও গোত্রগুলো অস্থির। বড় বড় দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীরা মাথা কাত করে দিয়েছেন। কিন্তু তাদের সন্ধানে মিলছে না যে, আমাদের হারানো সম্পদটা কোথায়? লোকজন যখন দেখলো, হৃদয়ের দরজা পাওয়া যাবে না, তাতে প্রবেশও সম্ভব নয় এবং সে হৃদয়কে আলোকিত ও উত্তপ্ত করার উপাদানও আমাদের কাছে নেই, তখনই তারা মস্তিষ্কের দিকে মনোযোগ দিলো। মানুষের বিদ্যা বাড়তে শুরু করলো। যে বিষয়টি সহজসাধ্য ছিলো, সেটিই করতে লাগলো। মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছা সহজ ছিলো, তাই অন্তর ছেড়ে দিয়ে মানুষ মস্তিষ্কের পথ অবলম্বন করে চলেছে।

আজ সকলেই সে কাফেলার অংশীদার। যে-ই আসছে, সেখানেই যাচ্ছে; অন্তরের ভিতরে পৌছার কোন প্রচেষ্টা নেই। দুনিয়ার অবস্থান যতক্ষণ পর্যন্ত স্ব-স্থানে না ফিরে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধন অসম্ভব। ঘরে অন্ধকার থাকলে বাহির থেকে আলো সংগ্রহ করতে হবে এবং ঘরের হারানো পুঁজি ও মনের লুণ্ঠিত সম্পদ ঘরে আর মনেই তালাশ করতে হবে। যদি এমনটি করা না হয়, তবে জীবন ফুরিয়ে যাবে; তথাপি হারিয়ে যাওয়া বস্তুর কোনই খোঁজ পাওয়া যাবে না।

বাস্তবতা থেকে কিশতী নড়ানো যায় না

আজ তাই প্রয়োজন ছিলো বাস্তববোধ জাগিয়ে তোলার, এই বাস্তবতার অনুসন্ধান মানবজীবনের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করার। এর ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিক হতো, পশুর স্তর থেকে মানুষ হতো উন্নত, জন্ম হতো একজনের প্রতি অন্য জনের ভালোবাসা, একের জন্য অন্যের আত্মোৎসর্গের প্রেরণা। বিবেচনা করতো একজন অন্যজনকে ভাইরূপে; বন্ধ হতো প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃষ্টি, নির্ভরতা ও ভালোবাসার চোখ সৃষ্টি হতো। কিন্তু এ বাস্তবতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় বাস্তবতা এবং যাবতীয় বাস্তবতার প্রাণ এই ছিলো যে, এই দুনিয়া নামক কারখানাটি কে বানিয়েছেন, সে প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান। এই কারখানাটি যথার্থভাবে চলতে পারে একমাত্র তাঁর মর্জি ও নির্দেশনা অনুযায়ী। যদি তাঁর সাথে লড়াই করার প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালিত না হয়, তাহলে কারখানাটি লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে। ঘড়িকে উদাহরণ রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। যিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তিনিই তার গঠন ও কাঠামো সম্পর্কে সচেতন। তিনিই ঘড়ির সবকিছু ঠিক করতে পারেন। কোন মানুষ যত বড় আলেম, প্রাজ্ঞ, মেধাবী ও দার্শনিকই হোন না কেন, ঘড়ি কিন্তু তার প্রজ্ঞা ও মেধার সাহায্যে ঠিক হবে না। সে চলবে তার বিশেষজ্ঞের পরিচালনায়। এই দুনিয়া যিনি বানিয়েছেন, দুনিয়াটা তাঁরই হেদায়াত ও নির্দেশনায় ঠিক ঠিক মতো চলবে। বাস্তবতা থেকে নৌকাকে নড়ানো যায় না। কিশতী তার গতিপথেই এগিয়ে যেতে থাকবে। তার সামনে মাথা নোয়াতেই হবে।

মানুষ পৃথিবীর ট্রাস্টি

এখন আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ কিছু কথাবার্তা বলতে চাই। অভিশাপ সেই জীবনের প্রতি, যে জীবনে কখনো সত্য কথা বলা যায়নি। আজ সব মানুষই লাভালাভ লক্ষ্য করে চলে। লাভালাভ সামনে রেখে সত্য-মিথ্যা বলতে সামান্যতম দ্বিধা করে না, পৃথিবীতে এমন মানুষের সংশোধন অসম্ভব। পক্ষান্তরে অল্পসংখ্যক এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা জীবনের উপর ঝুঁকি আসলেও সর্বদাই সত্য উচ্চারণ করে যান। মুষ্টিমেয় এমন ক'জনার জন্যই দুনিয়াটা এখনো টিকে আছে।

আজ পৃথিবীর চেহারায় যে সামান্য আলোকচ্ছটা আর দ্যুতি ঝিলিক দিচ্ছে, তা সেই সত্যকণ্ঠ পয়গাম্বর, আল্লাহর প্রেরিত মনীষিগণের কলিজাসেঁচা খুনের

ফল, যাঁরা মানবতার কল্যাণ এবং মানবতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজেদের জীবনগুলো বিসর্জন দিয়েছেন। এ পবিত্র উত্তরাধিকার এবং অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়েছি এখন আমরা। মানবতার মুক্তি সেই আলোকোজ্জ্বল পথেই আসতে পারে– যে পথ প্রদর্শন করে গেছেন তাঁরা। আজও যখন আমরা এ সত্য উপলব্ধি করি না যে, দুনিয়া আমাদের জন্য এবং আমরা আল্লাহ্‌র জন্য, দুনিয়াতে আমরা তাঁর প্রতিনিধি ও আমানতদার; তাঁর সামনে দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে, তখন মানবতার সমস্যাগুলোর সমাধান আর সম্ভব নয়। এ পথটি বিপদসংকুল ও কন্টকাকীর্ণ, কিন্তু এটাই মানবতার পথ। এটি একটি মহান দায়িত্বের বিষয় ছিলো। লোকজন তা ভুলে গেছে এবং উদ্ভট সব কালচার ও সভ্যতার নাম আওড়ানো শুরু করে দিয়েছে।

প্রাচীন সভ্যতা ব্যর্থ

পৃথিবীর সকল সভ্যতাই সম্মানযোগ্য। বিশেষতঃ আমাদের দেশের সভ্যতা আমাদের খুবই প্রিয়। এই সভ্যতা আমাদের উত্তরাধিকার এবং আমরা এর মর্যাদা দিয়ে থাকি। কিন্তু মানবতার যথার্থ উন্নয়ন প্রাচীন সভ্যতার দ্বারা হতে পারে না। এগুলোর মাঝে এখন আর প্রাণ নেই। এগুলোর উপযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। এগুলো স্ব স্ব মিশন পালন করে ফেলেছে, সমাপ্ত করে গেছে নিজেদের ভূমিকা। এগুলোর বিভিন্ন অংশ এখনও খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয়। কিন্তু আজ মানবতার উন্নয়ন ও ব্যাপক চারিত্রিক ধ্বস ঠেকানোর জন্য এগুলোর মাঝে কোন প্রাণ অবশিষ্ট নেই। এগুলোর কাছে এখন আর কোন পয়গাম নেই। এক জায়গার বস্তু অন্য জায়গায় প্রয়োগ করা যায় না, তেমনি দু'হাজার বছর আগের নিষ্প্রাণ বিষয় আজকের পরিবেশে কোন প্রভাব রাখতে পারে না। আরবদের প্রাচীন সভ্যতা, রোমান ও গ্রীকদের নিজস্ব সভ্যতা স্ব স্ব কাল ও স্থানে জীবন্ত ও প্রগতিশীলই ছিলো কোন কোন বিবেচনায়, কিন্তু এখন সেগুলো তার প্রাচুর্য ও চমক হারিয়ে ফেলেছে। এগুলোর স্থান এখন শুধুমাত্র প্রাচীন কীর্তির যাদুঘর ও সংগ্রহশালাতেই বিদ্যমান।

সভ্যতা মানবতার পোষাক

মানবতা সভ্যতার উর্ধ্বের বিষয়। এই সকল সভ্যতা একত্রিত হয়েও মানবতা ও মনুষ্যত্বের জন্ম দিতে পারে না; মনুষ্যত্বই জন্ম দেয় সভ্যতার। মনুষ্যত্ব কোন নির্দিষ্ট সময় ও স্থানের সাথে নির্ধারিত নয়; সভ্যতা তার পোষাক

মাত্র। মনুষ্যত্ব তার পোষাক পাল্টাতে থাকে; নিজের বয়স ও রুচির উপযোগী করে সে নিজেকে ক্রমাগত ভাবে উপস্থাপন করে যেতে থাকে। বলাই বাহুল্য যে, এটি নিতান্তই প্রাকৃতিক ও প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। শিশুর পোষাক শিশু পরবে এবং যুবকের পোষাক যুবক, শিশুর পোষাক যুবককে পরানো যাবে না। মানবতা ও মনুষ্যত্বকে কোন বিশেষ কাল ও রাষ্ট্রের কালচারের অনুগত করে ফেলবেন না। মানবতাকে এগিয়ে যেতে দিন। আবে হায়াতের প্রস্রবণ হচ্ছে মানবতা, এটাকে উথলে উঠতে দিন। প্রান্তর-মরুভূমি এবং মাঠে-ময়দানে এই মানবতা দৌড়ে চলতে চায়, তাকে বাড়তে ও ছড়িয়ে পড়তে দিন। ধর্মের বিশ্বজনীন জীবন্ত নিয়মাবলী এবং নিজস্ব মেধা ও রুচির সাহায্যে মানবতার একটি নমুনা এবং একটি নতুন চিত্র আঁকুন। চারিত্রিক সৌন্দর্যের নতুন একটি পুষ্পস্তবকের জন্ম দিন। সেই পুষ্পস্তবকটিই হবে শ্যামল-সতেজ। যে ফুল শুকিয়ে গেছে, নেতিয়ে গেছে, সেটাকে গলার হার বানাবার চেষ্টা বারবার করবেন না।

ধর্মই দেয় প্রাণ

ধর্ম এবং সভ্যতার পথ ভিন্ন। ধর্ম আত্মা দান করে এবং কালচার দেয় একটি ছক (Model)। ধর্ম দেয় জীবনপদ্ধতি এবং একটি মূলনীতি। কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, অতঃপর স্বাধীন ছেড়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ– কোন কোন সভ্যতার বিবেচনায় শিশ কলম হলো পবিত্র। অথচ লেখার কর্মটি লোহার কলমে হবে, নাকি ফাউন্টেন পেনে হবে– এ বিষয়ে ধর্মের কোন আলোচনা নেই। ধর্মের দাবি শুধু এতটুকুই যে, যা লিখা হবে, তা যেন সত্য ও কল্যাণকর হয়। ধর্ম জীবনের লক্ষ্য উপহার দেয় এবং জীবনের মাঝে সৃষ্টি করে প্রাণ। ধর্ম জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে, কিন্তু মানুষের উদ্যম ও প্রগতির শক্তি হরণ করে না। তাকে এগিয়ে যেতে দেয় এবং উৎসাহিত করে। কালচারের পুণরুজ্জীবনে মানুষের মুক্তি নেই, সে পুনরুজ্জীবন কোন হিন্দু কিংবা মুসলিম কিংবা খ্রিষ্টানের দ্বারাই হোক না কেন।

আজ এ বিষয়ে ভীষণ বিতর্ক উঠেছে যে, রাষ্ট্রের ভাষা কি হবে এবং লিপিপদ্ধতি কোন্‌টি অনুসৃত হবে? মনে হচ্ছে যে, মানবতার সমবেদনার ভিত্তি এগুলোর উপরই গড়ে উঠেছে! আর রাষ্ট্রের সংশোধনও এ বিতর্ক নিষ্পত্তির মাধ্যমেই সম্ভব! পয়গাম্বরগণের চিন্তার পন্থা এরকম ছিলো না। লেখা কোত্থেকে শুরু করা হবে এবং কোথায় শেষ করা হবে, ডান দিক থেকে শুরু করে বাম দিকে, নাকি

বাম দিক থেকে শুরু করে ডান দিকে, এক্ষেত্রে তাঁদের কোন উৎসাহ ছিলো না। তাঁদের উৎসাহ ছিলো এই বিষয়ে যে, লেখক যেন সত্যবাদী, আল্লাহভীরু, আমানতদার এবং দায়িত্ববান হয়। এরপর সে যেভাবেই লিখুক, তা মঙ্গলজনক হবে। বানারসে আমি বলেছিলাম, যদি পাণ্ডুলিপি মিথ্যাচার সম্বলিত হয়, তবে কি ডান দিক থেকে শুরু করে উর্দু-ফারসীতে লেখার দ্বারা কিংবা বাম দিক থেকে শুরু করে হিন্দী-ইংরেজীতে লিখার দ্বারা তা সত্য হয়ে যাবে? মিথ্যা ও কৃত্রিম রচনা যে পদ্ধতি এবং যেদিক থেকেই লেখা হোক না কেন, তা মিথ্যা, কৃত্রিম এবং পাপ হয়েই থাকবে। সত্য রচনা যে পদ্ধতি ও যেদিক থেকেই লিখা হোক, তা সত্যই থাকবে। পয়গাম্বরগণ লিপিপদ্ধতির পিছনে সময় অপচয় করতেন না। তাঁরা সেই হাত সঠিক বানাতে চাইতেন, যে হাত কলমের সাহায্য গ্রহণ করে; বরং তাঁরা সেই হৃদয়কেই ঠিক করতেন, যা সেই হাতকে নির্দেশ করে থাকে।

উপকরণ লক্ষ্য নয়

নিজ নিজ যুগে নতুন নতুন আবিষ্কার করা যন্ত্র ও মেশিন তৈরী করা পয়গাম্বরগণের কাজ ছিলো না। তাঁরা মূলত এমন সব মানুষ জন্ম দিতেন, যারা এইসব যন্ত্র ও উপাদানকে সঠিক উদ্দেশ্যে সঠিক পথে ব্যবহার করতে সক্ষম হতো। ইউরোপ জন্ম দেয় উপাদান, পয়গাম্বরগণ উপহার দিয়েছেন লক্ষ্য ও গন্তব্য। তাঁরা মেশিন গড়েননি, মানুষ গড়েছিলেন। ইউরোপ তো মেশিন তৈরী করেছে। কিন্তু সেই মেশিনগুলো ব্যবহার করবে কে? পশু স্বভাবের মানুষ? আজ মস্তবড় বিপদ হলো এই যে, উপাদান বহু, আবিষ্কার বহু এবং সম্পদও বহু; কিন্তু সঠিক পথে ব্যবহারকারী মানুষ আজ দুষ্প্রাপ্য।

সমব্যথী মানুষের প্রয়োজন

মানবতার জন্য আজ বিশ্বাস, আস্থা, সততা, পবিত্রতা, ভালোবাসা ও মনুষ্যত্ব এবং সহানুভূতি ও সমবেদনার ভীষণ প্রয়োজন। এসবের ভিত্তি সভ্যতা কিংবা লিপিপদ্ধতি নয়। এর জন্য প্রয়োজন সমব্যথী, সহানুভূতিশীল মানুষের যারা অন্যের জন্য আত্মবিসর্জন দেয়, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আরেক জনকে গড়ে তোলে। লেখা ও সভ্যতায় মানুষ জন্ম হয় না। ইউরোপ আমাদের কাছ থেকে চরিত্র এবং আত্মিক মূল্যবোধ ছিনিয়ে নিয়েছে। অথচ এক্ষেত্রে স্বয়ং তারা ছিলো শূন্যহস্ত। এখন আমাদেরও তারা দেউলিয়া বানিয়ে দিয়েছে। তারা তথ্যজ্ঞান ও শিল্প দিয়ে আমাদের পূর্ণ করে দিয়েছে। আমাদের রাত্রিগুলো তারা প্রদীপ দিয়ে

আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছে, বিদ্যুতের চমক দিয়ে উজালা করে দিয়েছে। আমাদের কিন্তু প্রয়োজন ছিলো হৃদয়ের প্রদীপ। তারা হৃদয়ের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে গেছে। মুবারক ছিলো সেই সময়, যখন হৃদয়ে আলো ছিলো, বিদ্যুতের আলো ছিলো না। আপনি নিজেই ভাবুন, কোন যুগটা আপনার পছন্দ হয়? যে যুগে মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও সহানুভূতি ছিলো, সেই মানবতার সহানুভতি ও সমবেদনার যুগ? নাকি সেই যুগ, যে যুগে মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নেই, আছে প্রেস, মেশিন, বিদ্যুতের পাখা? আজ হৃদয়ের স্থিতি ও প্রশান্তি সহজপ্রাপ্য নয়। কিন্তু অর্থবিত্ত প্রচুর। আজ সবকিছুই আছে, কিন্তু আত্মিক মূল্যবোধ বিলুপ্ত। সবকিছু আছে, উদ্দেশ্য নেই। যার গলায় কাঁটা আটকে আছে, পিপাসায় যে কষ্ট পাচ্ছে, তারতো চাই আজলা ভর্তি পানি। তার জন্য সবকিছু কিছুই না। মুদ্রার স্তূপ জমা হয়ে থাকলেই তার লাভ কি? তাই আজকের সংস্কৃতিতে বিন্দুমাত্র ভালোবাসা নেই, নামটিও নেই আত্মত্যাগ ও সহানুভূতির। যাকেই দেখবেন, সে স্বার্থের দাস। সেই সংস্কৃতি নিয়ে আমরা কী করবো? কী করতে পারি?

আমরা হারিয়েছি হৃদয়ের পথ

সমস্ত ভুল এভাবেই হচ্ছে যে, সঠিক দরজা দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করা হচ্ছে না, খিড়কী দিয়ে সকলেই ঘরে প্রবেশ করছে। হৃদয়ের দরজা বন্ধ। ভিতরে প্রবেশের পথ সেটিই ছিল। হৃদয়ের পথ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আত্মস্বার্থ নিয়ে আমরা সেখানে পৌঁছতেও পারবো না। পৃথিবীর বিপথগামিতা, নিষ্ফল অহংকার, প্রবৃত্তির কর্তৃত্ব– এসব কিছুরই উৎসমুখ হলো হৃদয়। এই হৃদয়ে যখন এক খোদার কর্তৃত্ব নেই, তাঁর প্রাবল্যের বরণ নেই, নেই তাঁর সামনে জবাবদিহির উপলব্ধি, তখন আর হৃদয়ের কী অভিযোগ থাকতে পারে? কার কী স্বার্থ আছে– যে, সে অন্যের সাহায্য করবে এবং অন্যের জন্য নিজেকে ফেলবে ঝুঁকির মুখে? আজকের পৃথিবীতে ভাই ভাইকে বেনিয়া সুলভ দৃষ্টিতে দেখছে। প্রত্যেকেই অন্য আরেকজনকে গ্রাহক ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছে। সব দিকেই লুট-পাটের (Exploitation) বাজার উত্তপ্ত। মানবীয় স্বভাব বা ফিতরাতে ইনসানী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাপ-সন্তানের প্রতি ক্রুদ্ধ, উস্তাদ শাগরেদের প্রতি নাখোশ।

শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি

আজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিলাপ উঠেছে– ছাত্ররা শ্রদ্ধা করে না, শিক্ষকরা করেন না স্নেহ ও সহানুভূতির আচরণ। সবাই এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। এর সংশোধনের লক্ষ্যে বহু ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, কিন্তু এর শিকড় ও মূলের

দিকে গভীর চিন্তা নিয়ে লক্ষ্য করা হচ্ছে না যে, যে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ গঠনটিই বস্তুকেন্দ্রিক, শেষ পর্যন্ত তার দ্বারা ফলাফল কি-ই আর আসতে পারে? শিক্ষার কোন স্তরটি আছে, যেখানে নৈতিকতা ও চরিত্র নির্মাণের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে? এ সমস্ত অবক্ষয় তো এই শিক্ষা ব্যবস্থার অনিবার্য ফল। আপনাদের সাহিত্য ও শিল্পতো প্রবৃত্তিজাত রিপুগুলোর জন্ম দিচ্ছে এবং মানুষকে বানাচ্ছে সুবিধাবাদী। আপনাদের পরিবেশ ও সুবিধা যৌথভাবে এমন স্থানে আপনাদের উপনীত করে থাকে, যেখানে প্রবৃত্তি ও স্বার্থের সন্তুষ্টি এসে যায়; সেগুলো আপনাদেরকে বিত্তবান ও মহাজন হওয়ার জন্য প্রেরণা দেয়। তাই এখন প্রয়োজন হৃদয় ও মানুষের পরিবর্তন। এ দু'টির পরিবর্তন ব্যতীত কোন পরিবর্তনই সম্ভব নয়।

মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন

আজ আমাদের দেশে কতগুলো সংস্কারধর্মী ও সামাজিক আন্দোলন চলছে। আমরা সব কটিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। সাধ্য থাকলে সহযোগিতাও করি। বিশেষত 'ভুদান আন্দোলন',* কিন্তু জমি গ্রহণের পূর্বে হৃদয়-মনে এ অনুভূতি জন্মানোর প্রয়োজন অধিক যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি কেউ রাখতেই পারে না, তাহলে মানুষ স্বেচ্ছায় জমি দানে প্রস্তুত হয়ে যাবে। এমন মানসিকতা গঠিত হয়ে যাবে যে, লোকজন অভাবী মানুষকে নিজেদের জিনিস বিতরণ করে আনন্দ পাবে।

আমরা ইতিহাসে পড়েছি, মক্কা-মদীনার মাঝে ছিলো বংশ-পরম্পরার দ্বন্দ্ব। তাদের মাঝে বৈপরিত্য ছিলো, সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনেও। কিন্তু যখন মক্কা থেকে কিছু মানুষ মদীনায় চলে আসতে বাধ্য হলেন এবং নিজেদের সকল ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য ছেড়ে শূন্য হাতে মদীনায় চলে আসতে হলো, তখন বিত্তশালী ও সামর্থবানদের সঙ্গী বানিয়ে দেয়া হলো তাদেরকেই, যাদের সে মুহূর্তে কিছুই ছিলো না। মদীনার সামর্থবান লোকেরা মক্কাফেরত নিঃস্ব ভাইদেরকে বুকের সাথে মিলিয়ে নিলেন। বিত্তবান আনসারগণ মুহাজিরদের সামনে এনে রেখে দিলেন তাদের সম্পদের অর্ধেক। এদিকে হিজরত করে চলে আসা মুহাজিরদের মনটাও এমন বানানো হয়েছিলো যে, তারা আনন্দে মদীনার ভাইদেরকে দুআ জানালেন, শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন– এতসব কিছুর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। এখন সম্ভব হলে আমাদেরকে সামান্য কিছু ঋণ দিন আর বাজারের পথটা বাতলে দিন। আমরা মক্কাতেও ব্যবসা করেছি,

* পঞ্চাশের দশকে ভারতে প্রচলিত একটি সামাজিক আন্দোলন।

এখানেও ব্যবসা করতে পারবো। এভাবেই ইসলামের পয়গাম্বর মদীনাবাসীর মাঝে আত্মত্যাগ ও সহানুভূতির প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। অন্যদিকে মক্কাফেরত মুহাজিরদের মাঝে জাগিয়ে তুলেছেন আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদাবোধ। একদল ঘরের সম্পদ আগন্তুকদের পায়ের কাছে লুটিয়ে দিয়েছিলেন, আর অন্যদল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজেদের হাত-পা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের মাথা নিচু হয়ে আসে যখন আজকের উদ্বাস্তু মুহাজিরদের দিকে তাকাই। একদিকে আত্মত্যাগ ও সহানুভূতির অভাব, অন্যদিকে অভাব আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদার।

আমরা বলছি, এই মানসিকতা বদলে ফেলুন। হৃদয়ে ভালোবাসা জন্ম দিন, এমন হৃদয়ের জন্মদিন, যা অন্যের দুঃখে বিচলিত হয়ে যায়। দেশ ভাগের পূর্বে মানুষের হৃদয়ে এই আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন ছিলো, যা থাকলে অন্যের বেদনা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কমিউনিজম প্রশাসন ও রাষ্ট্রের সাহায্যে কার্যোদ্ধার করে। পক্ষান্তরে ধর্ম হৃদয়ের অবস্থাই এমন করে দেয় যে, মুদ্রা-সম্পদকে হিংস্র সাপ-বিচ্ছু মনে হতে থাকে। মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য দাঁড়ালেন; সেই নামায- যে নামায প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার চোখের শীতলতা হলো নামায; যার জন্য তিনি উতলা হয়ে উঠতেন। মুআয্যিন বিলাল (রাযি.)কে বলতেন, 'নামাযের ইহতিমাম করো এবং আমার চিত্তপ্রশান্তির আয়োজন করো।' সেই নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে হঠাৎ ঘরের ভিতরে গেলেন এবং কয়েকটি মুহূর্ত কাটিয়ে ফিরে এলেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কোন্ জরুরী কাজের কথা স্মরণ হলো যে, নামায ছেড়ে আপনাকে ভিতর থেকে ঘুরে আসতে হলো?' উত্তর দিলেন 'ঘরে সামান্য স্বর্ণ জমা হয়েছিলো, আমি তা দরিদ্র লোকের মাঝে বিলি করে দিতে বলে এলাম।'

কোন ভাষাই অন্যের নয়

আমি মুসলমানদের বলবো, সাহস বাড়ান। কোন ভাষার সাথে আপনাদের বৈরিতা নেই। কোন ভাষার সাথে আপনাদের দূরত্ব ও শত্রুতার সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। আপনারা ফার্সীকে আপন করেছেন, হিন্দীকে কেন আপন করতে পারছেন না?* আমাদের দেশের ভাষা কত চমৎকার ভাষা! কিন্তু আমি আমার

---

* ভারতের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তব্যে সেখানকার বাস্তবতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। –অনুবাদক

হিন্দু ভাইদেরও বলবো, প্রশান্ত মনে ভেবে দেখুন! মানবতার মুক্তি এই ভাষা কিংবা ঐ ভাষায় নেই। মুক্তি নেই স্বতন্ত্র কোন সংস্কৃতি ও কালচার আত্মস্থ করার মাঝে। আপনারা সকলেই মানুষের মাঝে আত্মত্যাগের প্রেরণা, সততার উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন। মানুষকে মানুষ বানান, তাকে শিখান মানবতার মর্যাদা দানের পাঠ। আজ মানুষের অভ্যন্তর পঁচে গেছে। সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র তার দেশ ও জাতিকে গ্রহণ করতে। শ্বেতাঙ্গদের দাবী আটলান্টিকের ওপারে মানুষ নেই।' প্রতিটি রাষ্ট্রের অধিবাসীরাই নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে মানুষ ভাবতে চায় না। সকল পর্যায়ে বিভক্তির জন্য জোটবদ্ধতা ও স্বার্থপরতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। কমিউনিস্টদের চোখে এক শ্রেণীর স্বার্থ, আমেরিকা ও পুঁজিবাদীদের চোখে অন্য শ্রেণীর স্বার্থ প্রধান হয়ে উঠেছে। একজনের চোখে পঁজিপতি বলতে কিছুই নেই। অন্য জনের চোখে শুধুমাত্র কৃষক-মজদুরদের অস্তিত্বই মুখ্য। কেউ কাউকে দেখতে নারাজ। এই গোষ্ঠীপ্রীতি ও সংকীর্ণ দৃষ্টি বড়ই ভয়াবহ।

আল্লাহ্র উপাসনার আন্দোলন প্রয়োজন

আজ আল্লাহ্র উপাসনা ও মানবতা প্রেমের আন্দোলনের প্রয়োজন। এর জন্য আজ মহা কোন এক উদ্যোগের প্রয়োজন, প্রয়োজন একটি ভূমিকম্পের। আল্লাহ্-উপাসনার একটি ঝড়ের প্রয়োজন; যে ঝড় আত্মস্বার্থের বিশাল পাহাড়গুলোকে ধ্বসিয়ে দিতে পারে, উড়িয়ে দিতে পারে প্রবৃত্তির পর্বতচূড়া। নগরীর পর নগরী, গ্রামের পর গ্রাম যেন চিৎকার করে বলছে- 'পশুসুলভ জীবন বাঁচিয়ে রাখার যোগ্য নয়। বস্তুবাদের বৃক্ষ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। দুনিয়ার উপর ছেয়ে থাকা স্বার্থপূজার শিকড়-বাকল উপড়ে গেছে। মানুষ! নিজের মর্যাদা উপলব্ধি করো। জীবন্ত বাস্তবতার সাথে নিজের কিসমতকে বাঁধো। আল্লাহ্র অপরিসীম শক্তির প্রতি ধাবিত হও।'

জ্ঞান ও নৈতিকতার সহযোগিতা

সেই বৈরাগ্য ও যোগীতন্ত্র আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যা দুনিয়াকে পাশ কেটে চলার শিক্ষা দেয় এবং গুহা ও পাঁহাড়ে নিজের আবাস সন্ধান করে। আমরা সেই আধ্যাত্মিকতার দাওয়াত দিচ্ছি, সমান্তরালভাবে যা জীবনের সাথে সাথে চলে; বরং জীবনের পথ প্রদর্শন করে। প্রাচীনপন্থী কিংবা অগ্রসরতার বিরোধী আমি

নই। মানবতার স্বার্থেই প্রয়োজন এবং মানবতার চাহিদা ও আবেদন এই যে, নৈতিকতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আল্লাহ্-প্রেম পাশাপাশি চলুক। এ বিষয়ে আজ ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। এসবের মাঝে পরস্পর সহযোগিতা ও নির্ভরতা নেই। বিজ্ঞান একদিকে যাচ্ছে তো নৈতিকতা অন্যদিকে। উভয়েই ভিন্নমুখী কট্টর চরমপন্থী (Extremist) হয়ে উঠেছে।

বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিকতা

বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মিকতার মাঝে ব্যবধানটি এমনই। একটি দুনিয়াকে পূজা করতে করতে একদম গিলে ফেলতে চায়। অন্যটি দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং দুনিয়ার প্রতি থাকে বিতৃষ্ণ। আমরা বলি বস্তু-উপাদান ও প্রযুক্তিকে খোদাপ্রদত্ত নেয়ামত মনে করে তার বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করুন! সেগুলোকে নিজের দাস মনে করুন! নিজে সেগুলোর দাস বনে যাবেন না! সেই জীবনের পূজাও করবেন না এবং তার প্রতি ঘৃণাও পোষণ করবেন না! আল্লাহ্র সামনে যে নিজেকে জবাবদিহি করতে হবে, তা অনুভব করুন এবং তাঁর আদালতের সামনে হাজির হয়ে পুরস্কার কিংবা শাস্তি লাভের বিশ্বাস জন্মান। তাঁর প্রেরিত নিঃস্বার্থ এবং নিষ্ঠাবান পয়গাম্বরগণের উপর আস্থা স্থাপন করুন এবং তাঁদের থেকেই এ জীবন পরিচালনার বিধি-বিধান শিক্ষা নিন। নিজেকে আল্লাহ্র জন্য গড়ে তুলুন, দুনিয়া আপনার জন্য হয়ে যাবে।

জীবন গঠনে ব্যক্তির গুরুত্ব

[১৯৫৫ ইং সনের ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে বর্তমান ভারতের জৌনপুর টাউন হলে ভাষণটি প্রদান করা হয়। সেখানে মুসলিম জনসাধারণের পাশাপাশি হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী শিক্ষিত মানুষেরা ছিলেন শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত।]

গন্তব্যহীন যাত্রা

সবাই জানেন, আমাদের সমাজ ও বর্তমান জীবন পদ্ধতিতে অবশ্যই কিছু না কিছু ত্রুটি কিংবা অসম্পূর্ণতা রয়েছে যার ফলে জীবনের অবকাঠামো যথার্থভাবে বসছে না এবং তার কোন আশাব্যঞ্জক ফলাফলও প্রকাশিত হচ্ছে না। একটি ত্রুটি দূর করলে অতিরিক্ত চারটি ত্রুটির জন্ম হচ্ছে। আজকের পৃথিবীর উন্নত ও বড় রাষ্ট্রগুলিও এই ত্রুটির অনুযোগকারী। তারাও অনুভব করতে শুরু করেছে যে, ভিত্তিমূলে কোন ত্রুটি রয়ে গেছে।

কিন্তু তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ জটিল সমস্যাগুলি থেকেই তারা নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। আমরা সেসব সমস্যা ও তার থেকে নিষ্কৃতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করছি না। তথাপি বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেসব সমস্যা ও বিষয়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, মানবতা ও মনুষ্যত্বের বিবেচনা। কারণ আমাদের প্রধান পরিচিতি ও অবস্থান মানুষ হিসেবেই। এজন্য সমস্যাগুলির অবস্থান পরবর্তী পর্যায়ে। যাদের হাতে বন্দী হয়ে আছে জীবনের বাগডোর, তারা জীবনের গাড়ি এতই দ্রুত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে, এক মিনিটের জন্যও তা থামিয়ে ত্রুটি অনুসন্ধান করতে তারা প্রস্তুত নয়। তারা দেখতে চাচ্ছে না যে, তারা সঠিক পথেই যাচ্ছে নাকি ভুল পথে রওয়ানা দিয়েছে। ভাবতে চাচ্ছে না যে, এই ত্রুটির ফলে এই গাড়ির যাত্রী কিংবা আগামী প্রজন্মের জন্য কি ধরনের সমূহ বিপদ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে; বরং তাদের একমাত্র ভাবনা হলো, সে গাড়ির চালক যেন তারাই হতে পারে। তাদের সকলেই ভিন্ন ভিন্নভাবে পৃথিবীকে শুধুমাত্র এই আশ্বাস বাণী-ই উৎকোচ হিসেবে প্রদান করছে যে, গাড়ির হেন্ডেল যদি তার হাতে থাকে, তাহুলে সে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে গাড়িটি চালিয়ে নিয়ে যাবে।

আমেরিকা, রাশিয়াসহ সকল শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকেরই দাবী ও প্রতিশ্রুতি হলো, যদি পৃথিবী নামক গাড়িটির চালক সে হতে পারে, তাহলে সে তা অন্যের চেয়ে আরো দ্রুত গতিতে চালিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তাদের কেউ এই চলার লক্ষ্য ও গন্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করছে না।

সংঘবদ্ধতার প্রতি আকর্ষণ

এবার আমি বলছি সেই ভুলটি কি এবং কোথায় হচ্ছে? পৃথিবীতে বড় বড় সংগঠন হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে সংঘবদ্ধতার প্রতি গুরুত্বটা দেয়া হচ্ছে অধিক। সব কর্মই করা হচ্ছে সংঘবদ্ধ ও সার্বজনীন ধাঁচে। সংঘবদ্ধতা ও সামষ্টিকতা একটি আকর্ষণীয় ও প্রগতিশীল প্রেরণা। কিন্তু ব্যক্তি ও তার যোগ্যতা সকল কাজ ও সংগঠনের ভিত্তি। কোন যুগেই এর গুরুত্ব অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এ যুগের বিপজ্জনক ভুলটি হচ্ছে এই যে, ব্যক্তির গুরুত্ব এবং তার চরিত্র ও যোগ্যতার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপও করা হচ্ছে না। প্রাসাদ নির্মিত হয়ে গেছে আর সকলে মিলে সেটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। কিন্তু যে ইটের সাহায্যে প্রাসাদটি তৈরী হলো, সেদিকে তাকাচ্ছে না কেউ। যদি কেউ প্রশ্ন ছুঁড়ে বলে– প্রাসাদের ইটগুলো কেমন? তাহলে উত্তর দেয়া হচ্ছে 'ইটগুলো ক্রটিযুক্ত, দুর্বল যেমনই হোক না কেন– প্রাসাদটি কিন্তু হয়েছে খুব মজবুত ও উন্নত।'

আমাদের বুঝে আসে না, শ' খানেক ক্রটিযুক্ত জিনিস মিলে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমষ্টি কিভাবে তৈরী হতে পারে? অধিক সংখ্যক ক্রটি যখন একটি অপরটির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়, তখন কি অলৌকিক ভাবে সেখান থেকে উত্তম কিছুর প্রকাশ ঘটে? শত শত অপরাধী ও অত্যাচারী এক সঙ্গে মিলে গেলে কি ন্যায়পরায়ণ কোন গোষ্ঠী কিংবা একটি ন্যায়-নীতিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হতে পারে? আমাদের তো এরকমই জানা আছে যে, ফলাফল সব সময় সূচনার অনুগামী হয় এবং সমষ্টি হয় তার প্রতিটি এককের বৈশিষ্টের প্রতিনিধি ও পরিচায়ক।

আপনি বিশুদ্ধ দাঁড়িপাল্লা অনুসন্ধান করছেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তার পাথরটি বিশুদ্ধ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িপাল্লা থাকবে অশুদ্ধ ও ক্রটিযুক্ত। তবে এটা কেমনতর যুক্তি ও দর্শন যে, ব্যক্তি গঠনের চিন্তা বর্জন করে একটি উত্তম সমষ্টি ও দলের প্রত্যাশা চলতে পারে?

অন্যায় উদাসীনতা

আজ স্কুল-কলেজ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নিরীক্ষাগার ও বিনোদনকেন্দ্রগুলিতে মানব জীবনের সকল বাস্তব ও কাল্পনিক প্রয়োজন পূরণের আয়োজন করা হচ্ছে। কিন্তু সেই মানুষগুলিকে মানুষরূপে তৈরী করার আয়োজন নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে না। তাহলে এসব প্রস্তুতি কি সেই সব মানুষের জন্য, যারা সাপ-বিচ্ছু হয়ে জীবন অতিবাহিত করবে যাদের জীবনে থাকবে না অহমিকা ও বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই? এ যুগের মানুষ অত্যাচার ও অপরাধ সংগঠিতভাবে করে চলেছে এবং এক্ষেত্রে তারা এগিয়ে গেছে হিংস্র জন্তুর চেয়েও বহুদূর। সাপ-বিচ্ছু, বনের বাঘ-সিংহ কি কখনো মানুষের উপর সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত আক্রমণ চালিয়েছে? কিন্তু মানুষ তার মতো মানুষকেই বিনাশ করার জন্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে, তৈরী করেছে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করার পরিকল্পনা। বর্তমানে ব্যক্তির প্রশিক্ষণ, তার চরিত্র গঠন এবং তার মাঝে মানবতার গুণাবলী ও নৈতিকতা জন্মানোর পরিবর্তে এগুলির প্রতিই উল্টো দেখানো হচ্ছে অন্যায় উদাসীনতা। এ কাজকে মনে করা হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বহীন। মেশিন বানানোর কত কারখানা আছে। আছে কাগজ ও কাপড় তৈরীর মিল। কিন্তু প্রকৃত মানুষ বানানোর জন্য কি কোন একটি প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণাগার আছে? আপনি বলবেন- এইসব বিদ্যাপীঠ, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি এগুলো? কিন্তু বেয়াদবী মাফ করবেন! সেখানে মানবতার পুনর্গঠন এবং ব্যক্তির পরিপূর্ণতার প্রতি কতোটা মনোযোগ দেয়া হয়? ইউরোপ ও আমেরিকা কত বিশাল ব্যয় ও আয়োজন করে এটমবোমা তৈরী করলো। যদি এর পরিবর্তে একজন পরিপূর্ণ মানুষ তৈরী করা যেতো, তাহলে কত উপকার হতো পৃথিবীর! কিন্তু এদিকে কারো মাথা যায় না।

আমাদের উদাসীনতার জের

আমাদের এতদঞ্চলে ভারত উপমহাদেশে বহু কালজয়ী ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে অতীতে। কিন্তু শতাব্দীকাল যাবৎ এ বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে। আমাদের বলতেই হচ্ছে যে, মুসলমানরাও তাদের শাসনামলে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন। এদের শাসন যদি খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিচ্ছবি হতো এবং তারা যদি এতদঞ্চলের শাসক ও পরিচালক হওয়ার চেয়েও অধিক হতেন এদেশের নৈতিকতার শিক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক, তাহলে আজ দেশের

নৈতিক অবস্থা এমন হতো না এবং তাদেরকেও এদেশের শাসন পরিচালনা থেকে অব্যাহতি দেয়া হতো না। এরপর ইংরেজ এসেছে। ইংরেজ শাসনটা ছিল স্পঞ্জের মতো, যার কাজ হলো গঙ্গার পাড় থেকে সম্পদ চুষে চুষে টেমসের পাড়ে নিয়ে ভিড়ানো। তাদের যুগে এতদঞ্চলের নৈতিক পতন যে কোত্থেকে কোথায় গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আজ আমরা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত। আমাদের উচিত ছিলো, সকলে মিলে প্রথম পর্যায়ে এই মৌলিক বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেয়া। ভেবে দেখা উচিত, এদেশ কি একদিন স্বাধীন ছিলো না? এরপর আবার কেন তা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলো? নিজেদের নৈতিক অধঃপতনের ফলেই তো। কিন্তু আফসোস! সড়ক আর বাতির প্রতি যতটুকু মনোযোগ দেয়া হয়, ততটুকু মনোযোগও এই মৌলিক বিষয়টির প্রতি নেই।

প্রতিটি সংস্কারধর্মী কাজের ভিত্তি

'আশ্রয়দান' ও 'ভূদান' আন্দোলনের যথেষ্ট মূল্যায়ন আমরা করে থাকি। কিন্তু আমরা এ বিষয়টি গোপন করতে পারি না যে, এর পূর্বেও করার মতো কাজটি ছিলো নৈতিক সংশোধন এবং বিশুদ্ধ অনুভূতির জাগরণ। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বহু পূর্বযুগে ভূ-সম্পত্তি বাধ্য-বাধকতার ভিত্তিতে বন্টন করা হতো। কোন কোন কাল এমনও গেছে যে, পানি আর বাতাসের মতো জমিকেও মানুষ একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু এবং মানুষের ঢালাও হক বিবেচনা করতো। কিন্তু পরবর্তীতে প্রয়োজন যাদের আছে, মানবীয় লালসা তাদের বঞ্চিত করেছে; আর অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের বানিয়েছে এগুলির মালিক। যদি নৈতিকতার অনুভূতি এবং মনুষ্যত্বের মর্যাদা জন্ম না হয়, তাহলে এ আশংকা থেকেই যাবে যে, বন্টনকৃত জমি আবারো পুনঃদখল হয়ে যাবে এবং অভাবী মানুষকে উচ্ছেদ করা হবে জমি থেকে।

এজন্যই যতক্ষণ পর্যন্ত কথিত অনুভূতির জাগরণ না ঘটবে এবং বিবেক ও অন্তর না হবে জাগ্রত, ততক্ষণ পর্যন্ত এসব প্রচেষ্টার ফলাফল এবং সমূহ প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করা যায় না। আজ নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে শেষ সীমা পর্যন্ত। ঘুষ, চোরাকারবারী, প্রতারণা, অবিশ্বস্ততারও এখানে কোন অভাব নেই বরং লোকজনের অভিযোগ হলো, এগুলো কিছুটা বেড়ে গেছে। বিত্তবান হওয়ার খায়েশ উম্মাদনায় রূপান্তরিত হয়েছে। কেউ নিজের দায়িত্ব অনুভব করছে না। মানসিক অবস্থাটা হচ্ছে এই যে, একজনের ভালো কর্মের আড়ালে

মন্দ করতে চাচ্ছে অন্যজন। যখন সকলের অবস্থাই এরকম হয়ে যাবে, তখন সেই ভালো কাজটি কোথেকে আসবে, যার আড়ালে মন্দটা লুকিয়ে রাখা যাবে?

আমার এক মিসরীয় বন্ধু তার ভাষণে একটা চমৎকার উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন– একবার এক বাদশাহ ঘোষণা করলেন, 'দুধ ভর্তি একটি পুকুর চাই। রাত্রে সকলেই এক লোটা করে দুধ পুকুরের মতো করে খনন করা এই বিশাল শূন্য গর্তে এনে ফেলবে। সকালে প্রত্যেকের মূল্য চুকিয়ে দেবো।' কিন্তু তখন প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিন্তা করলো 'আমি যদি সবার ফাঁকে এক লোটা পানি ঢেলে দিই, তাহলে কে জানবে? সবাইতো দুধই ঢালবে।'

ঘটনাক্রমে একই ভাবনা সবাই ভাবলো এবং অন্যের ভালো কাজ ও বিশ্বস্ততার আড়ালে নিজের মন্দটাকে চালিয়ে দিতে চাইলো। সকাল হলে বাদশাহ দেখলেন, সম্পূর্ণ পুকুরটাই পানিতে ভর্তি হয়ে আছে। দুধের নাম গন্ধও নেই সেখানে। কোন জনবসতির যখন অবস্থাটা এরকম হয়ে যায়, তখন কেউ সে জনপদকে হেফাযত করতে পারে না।

মনে রাখবেন! এতদঞ্চলের ধ্বংসের জন্য বাইরের দুনিয়ার প্রতি কোন ভয় পোষণ করার প্রয়োজন নেই। এদেশের সবচেয়ে প্রধান আশংকার কারণটি হলো, নৈতিক পতন, অপরাধীসুলভ মানসিকতা, সম্পদপূজা ও ভ্রাতৃহনন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা কি শত্রুরা ধ্বংস করেছে? না– বরং সেই নৈতিক ব্যাধিগুলোই তাদের গ্রাস করেছে, যা ছিলো দূরারোগ্য। তাছাড়া বর্তমানে যে কোন একটি দেশের নৈতিক পতন সমস্ত পৃথিবীর জন্যই আশংকার কারণ। পৃথিবী তখনই সুখী ও নিরাপদ হতে পারে, যখন প্রতিটি দেশ সুখী ও নিরাপদ হয়ে যায়।

পয়গাম্বরগণের কীর্তি

পয়গাম্বরগণের কীর্তিতো এটাই। তাঁরা সৎ মানুষ গঠন করেছেন। খোদাভীরু, মানবপ্রেমিক, সমব্যথী, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, সত্যপন্থী, নিপীড়িতের সাহায্যকারী ছিলেন তাঁদের গড়া মানুষ। পৃথিবীর অন্য কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রশিক্ষণাগার এমন সৎ লোক জন্ম দিতে পারেনি, গঠন করতে পারেনি। নিজের আবিষ্কার-উদ্ভাবনের উপর আছে পৃথিবীর অহংকার, বিজ্ঞানবাদীদের গর্ববোধ আছে তাদের অবদানের উপর, কিন্তু আমরা ভেবে দেখছি না, পয়গাম্বরগণের চেয়ে অধিক মানবতার সেবা আর কেউ কি করেছে? তাঁদের চেয়েও অধিক মূল্যবান বস্তু আর কেউ কি পৃথিবীকে দান করেছে?

তাঁরাইতো পৃথিবীকে বাগিচা বানিয়েছেন। তাঁদের কারণেই পৃথিবীর সবকিছু কর্মমুখর ও ফলপ্রসু হয়ে উঠেছে এবং সকল সম্পদ চিনে নিয়েছে তার ঠিকানা।

আজও পৃথিবীতে ভালো কর্মের যে প্রবণতা, যে সততা, ন্যায় ও মানবতার প্রেম পাওয়া যায়, তা এই পয়গাম্বরগণেরই প্রচেষ্টা ও ত্যাগের ফল। বিরাজমান এই পৃথিবীটাও শুধুমাত্র আবিষ্কার আর সভ্যতার উন্নয়নের কাঁধে সওয়ার হয়ে চলতে পারে না। উপরন্তু আজকের পৃথিবীটাও শুধুমাত্র সেই সততা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, যার জন্ম দিয়ে গেছেন পয়গাম্বরগণ।

পয়গাম্বরগণ এই সৎ মানুষ কিভাবে জন্ম দিয়েছেন? একথা কম বিস্ময়কর নয় যে, তাঁরা মানুষের হৃদয়ে এমন একটি নতুন বিশ্বাস জন্ম দিয়েছেন, যে বিশ্বাস থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকার ফলে পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছিলো এবং মানুষ ও মানুষের সমাজ হিংস্র পশু আর রক্তলিপ্সু জন্তুতে পরিণত হয়েছিলো। সে বিশ্বাসটি ছিলো, আল্লাহ্‌র একক অস্তিত্ব, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং জবাবদিহীর বিশ্বাস এবং এই পয়গাম্বরের প্রতি এই বিশ্বাসও তাদের মাঝে প্রোথিত করা হয়েছিলো যে, ইনি সত্যবাদী মানুষ, আল্লাহর হক পয়গামের বাহক এবং মানবতার সঠিক পথপ্রদর্শক। এ বিশ্বাস মানুষের কায়া সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে এবং তাকে উন্নীত করেছে একটি লাগামহীন জন্তুর স্তর থেকে একজন দায়িত্ববান মানুষে।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা

হাজারো বছরের অভিজ্ঞতা হলো, মানুষ গড়ার জন্যে ব্যক্তি গঠনের এই প্রক্রিয়ার চেয়ে বড় শক্তি আর কিছুই নেই। আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এটাই যে, বিভিন্ন দল আছে, গোষ্ঠী, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান আছে; কিন্তু সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি নেই। পৃথিবীর বাজারে এ বস্তুরই অভাব সর্বাধিক। ভয়াবহ বিষয়টি হলো, এক্ষেত্রে প্রস্তুতি গ্রহণের কোন ভাবনাও নেই। সত্যি করে জিজ্ঞেস করলে বলতে হবে– এ বিষয়ে প্রস্তুতির প্রচেষ্টাও যে দু'একটা হচ্ছে, তাতেও যথার্থ পথটি বেছে নেয়া হচ্ছে না। এর পথ শুধুমাত্র একটিই এবং তা হলো, আবারো বিশ্বাস জন্মানো। মানুষকে আগে মানুষ বানানো ছাড়া অপরাধ বন্ধ হতে পারে না। ত্রুটি দূর হতে পারে না। আপনি একটি চোরাপথ বন্ধ করবেন তো দশটি চোরা পথ খুলে যাবে। আক্ষেপ হলো– এই মৌলিক কাজের প্রতি যাদের

মনোযোগ দানের প্রয়োজন, যাদের মনোযোগে প্রভাব পড়ে, অন্য সমস্যা ও ব্যস্ততা থেকে তাদের নিষ্কৃতি নেই। তারা যদি এদিকে মনোযোগ দিতেন তাহলে এর ফলে সমগ্র জীবনাচারেই তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়তো এবং যেসব সমস্যা থেকে নিষ্কৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রচেষ্টা চালানোর পরও আশাব্যঞ্জক কোন ফলাফল দেখা যাচ্ছে না, সে সব সহস্র সমস্যা থেকেও সকলের উত্তরণ ঘটতো এবং নিষ্কৃতি মিলতো।

আমাদের প্রচেষ্টা

আমরা যখন দেখলাম এই বিশাল দেশে কেউ এ বিষয়ে ঘোষকের ভূমিকা পালন করছেন না, কেউ বানাচ্ছেন না এটাকে নিজের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তখন আমরা কয়েকজন নিঃস্ব সঙ্গী এ আহবানের জন্য নিজেদের ঘর ছেড়ে এসেছি। আমরা আপনাদের শহরে এসেছি। আপনারা আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন এবং আগ্রহ ও ধৈর্যের সাথে আমাদের কথা শুনেছেন। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের দারুণ উৎসাহ জেগেছে। আমরা এ ময়দানে নেমেছি, মানবতার এই বিস্তৃত বসতিতে অবশ্যই কিছু জীবন্ত প্রাণের সন্ধান মিলবে। পৃথিবীর সকল কাজ এ ধরনের মানুষের অস্তিত্বের বিশ্বাস এবং প্রাণ সজীবতার দিকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে।

এতবড় সম্মেলনে আমাদের প্রত্যাশা– নিশ্চয়ই অনেক অন্তরই আমাদের কথাগুলো গ্রহণ করে থাকবে। আমরা এ প্রত্যাশাও করি যে, যে হৃদয় আজ আমাদের কথা গ্রহণ করেছে, সে নিজেকে সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে, আজকের পৃথিবীতে সে ব্যক্তির প্রয়োজন, যে ধরনের ব্যক্তির অভাবে জীবন পারছে না তার ছক মতো চলতে।

একটি পবিত্র ওয়াক্ফ এবং তার মুতাওয়াল্লী

[বিনযেরা রোডের একটি মিশ্র সমাবেশে পঞ্চাশের দশকের কোন এক সময়ে ভাষণটি প্রদান করা হয়। হিন্দু-মুসলিমসহ বিভিন্ন ধর্মের নাগরিকের অংশগ্রহণে সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।]

রেওয়াজী সমাবেশ

বর্তমানে আমাদের দেশে সভা-সমাবেশের বিশেষ প্রচলন রয়েছে। কিন্তু এসব সমাবেশ মূলত দু' ধরনের হয়ে থাকে। একটি তো হলো এমন সব সভা-সমাবেশ, যা কেবল ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও স্বার্থ পূরণের জন্যেই অনুষ্ঠিত হয়। এর পিছনে কখনো কখনো কোন সংস্থা বা রাজনৈতিক দল কাজ করে; কখনো আবার কোন কোন সংস্থা বা রাজনৈতিক দলের নাম ব্যবহার করা হয়। এসবের স্পষ্ট উদাহরণ হলো, নির্বাচনী সমাবেশ। নির্বাচন উপলক্ষ্যে শহরে-শহরে, গাঁয়ে-গাঁয়ে বহু সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং তার পিছনে ব্যাপক চেষ্টা-তদবীর ব্যয় হয়, ব্যয় হয় বিপুল অর্থ, টাকা-পয়সা পানির মতো প্রবাহিত হয়। যিনি কোন আসনের জন্য দাঁড়ান, তিনি ভোটদাতা-নির্বাচকদেরকে নিশ্চয়তা দান করেন যে, নির্বাচনের জন্য তিনি-ই সর্বাধিক উপযোগী ও যোগ্য মানুষ। এসব সমাবেশে জীবনের নীতি ও নৈতিকতা এবং উন্নত নাগরিক হওয়ার শিক্ষা বিতরণ করা হয় না। তাদের আগ্রহ ও চাহিদা নিবদ্ধ থাকে শুধু এই বিষয়ে যে, তাদেরকে অধিক থেকে অধিকতর ভোট দেওয়া হোক। তাদের চোখে সেইসব লোকই কেবল প্রশংসাযোগ্য এবং সেইসব লোকেরই কেবল জীবনের মূল্য রয়েছে, যারা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং তাদেরকে ভোট প্রদান করে। ভোটদাতা শ্রেণী নৈতিকতার বিচারে পতিত এবং নীতি, চরিত্র ও আচরণের দিক থেকে নিকৃষ্ট পর্যায়ের হলেও তাদের কিছুই যায় আসে না। দ্বিতীয় ধরনের সমাবেশ হলো সেগুলো, যেগুলো শুধু ধর্মীয় প্রথা বা সামাজিক অনুষ্ঠানের সূত্রে অনুষ্ঠিত হয়। এসব সমাবেশ মুসলমানদের মাঝেও অনুষ্ঠিত হয়, হিন্দুদের মাঝেও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আক্ষেপের ব্যাপার হলো, ধর্মীয় সভা-সমাবেশ, যা কোন এক সময় বহু জাতির মাঝে জীবনের স্পন্দন

জাগানোর হাতিয়ারে পরিণত হতো এবং সংস্কার ও বিপ্লবের পয়গাম বয়ে নিয়ে আসতো, এখন সেগুলো আর কোন পয়গাম ও প্রোগাম নিয়ে আসছে না। এমনিভাবে সেইসব সামাজিক অনুষ্ঠান, যেসবের সাহায্যে কোন এককালে সংস্কার ও সম্প্রীতি জোরদার করা হতো, সেসব এখন আত্মাহীন, প্রাণহীন হয়ে গেছে এবং গৎ বাঁধা নিয়মে পর্যবসিত হয়েছে।

সমাবেশের প্রভাব–শূন্যতা

এইসব সমাবেশে লোকজন যেই মানসিকতা নিয়ে আসে, সেই মানসিকতা নিয়েই ফিরে যায়। তাদের মাঝে কোন পরিবর্তন, কোন রদবদল ঘটে না বরং এসব সমাবেশে অংশগ্রহণের ফলে এক ধরনের তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ জন্ম নেয়। এসব সমাবেশে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি মনে করতে থাকে, এই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সে অনেকটা নির্ভার ও পবিত্র হয়ে গেছে এবং ইতিপূর্বে যে পাপ সে করেছে, তা ধুয়ে-মুছে গেছে। বর্তমানে ধর্মের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় ও মাথায় কোন আঘাত আসছে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বরং আত্মতৃপ্তি ও স্বস্তির বৃদ্ধি ঘটছে।

ধর্ম ঃ ভ্রান্তিপূর্ণ জীবনের শত্রু

অথচ ধর্ম তো ভ্রান্তিপূর্ণ জীবনের শত্রু। পাপ এবং অনৈতিকতার সাথে তার সমঝোতা অসম্ভব। আগের যুগের জীবন-যাপনকারীরা এসব সমাবেশের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়তো। তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে ধর্ম কোন নিন্দা বর্ষণ করে কিনা, এ ভয়েই তারা কাতর হয়ে যেতো। কুরআন মজীদে হযরত শু'আইব (আ.) ও তাঁর জাতির মাঝের সংলাপ বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত শু'আইব (আ.) তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে বললেন– হে জাতি! মাপে কমতি করো না। তোমরা পাল্লা ঝুঁকিয়ে দিয়ে থাক এবং মাপে কম দিয়ে থাক। গ্রাহকের কাছ থেকে অধিক থেকে অধিকতর আদায় করার ধান্ধায় ডুবে থাক এবং তাদেরকে কম থেকেও কম প্রদানের ভাবনায় লিপ্ত থাক। এটাতো মহাপাপ!' হযরত শুআইব (আ.)-এর জাতি জবাবে তাঁকে বললো– তোমার নামায কি তোমাকে এই শিক্ষাই দেয় যে, আমাদের কর্ম পদ্ধতির বিষয়ে তুমি প্রশ্ন দাঁড় করাবে এবং আমাদেরকে আমাদের সম্পদে স্বাধীন কর্মকাণ্ড থেকে বাঁধা দেবে?' সেই জাতির শত্রু নির্ণয় সঠিক ছিল। নামায এইসব প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে থাকে এবং জীবনের মাঝে শুদ্ধ ও ভুলের পার্থক্য করে দেয়। একটি সঠিক ও জীবন্ত ধর্ম মানব জীবনে বিরাজমান ভ্রান্তি ও গুনাহ্‌র ব্যাপারে নীরব থাকতে পারে না।

আমাদের এই সমাবেশ নতুন ধারার। এটি নির্বাচনী সমাবেশসমূহের কোন সমাবেশ নয়, প্রথাগত ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহের কোন অনুষ্ঠানও নয়। আমরা এই সমাবেশে এ কথাই বলে যাওয়ার চেষ্টা করবো যে, জীবনের সঠিক পথ কোনটি এবং কেন মানুষ পতনের গহবরে পড়লো?

ত্যাগের প্রশ্ন

আপনি যখন কোন একটি কাজ করেন, তখন সবার আগে এ বিষয়টা মীমাংসা করে নিয়ে থাকেন যে, কাজটি করছেন কোন নিয়তে এবং এক্ষেত্রে আপনার সঠিক অবস্থান কী? দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে চলেছে, তার পিছনে এই মৌলিক বাস্তবতাই কাজ করছে যে, মানুষ দুনিয়ায় তাকে কী মনে করেছে এবং দুনিয়াতে তার স্থান ও পজিশনটা কী? যদি এই একটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠু অনুধাবন ঘটে যায়, তাহলে সকল কাজই সুষ্ঠু ও সঠিক হবে। আর এই ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ঘটে গেলে বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি অনবরত ঘটতেই থাকবে।

মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি

ইসলাম আমাদের একথাই বলছে যে, এই দুনিয়ায় মানুষ হচ্ছে খোদার নায়েব, আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি এবং দুনিয়ার ট্রাস্টি বা আমানতদার। গোটা দুনিয়াটা একটা ওয়াক্‌ফ এবং মানুষ তার মুতাওয়াল্লী। মানুষের দায়িত্বেই এখানকার ব্যবস্থাপনা ও হেদায়াতের কাজ। দুনিয়ায় ছোট-বড়, বহু ধরনের ওয়াক্‌ফ থাকে। এই গোটা বিশ্ব, সমগ্র সৃষ্টিজগত একটি মহত্তম ওয়াক্‌ফ বা ট্রাস্ট। দুনিয়াটা কারো ব্যক্তিগত মালিকানা বা বাপ-দাদার সম্পদ নয় যে, সে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে খাবে আর উড়াবে। এই ওয়াক্‌ফে প্রাণী, পশু-পাখী, গাছ, নদী, পাহাড়, সোনা-রূপা, খাদ্য দ্রব্য এবং দুনিয়ার যাবতীয় নেয়ামত বিদ্যমান। এ সবকিছুই মানুষকে সোপর্দ করা হয়েছে। কেননা মানুষ এসবের স্বভাবের সাথেও পরিচিত এবং এসবের প্রতি সহানুভূতিশীলও। মানুষকে খোদ এই ট্রাস্টের মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। মানুষ এই মাটিরই সৃষ্টি। আর কোন কিছুর ব্যবস্থাপকের জন্য ঐ বিষয়ে সচেতনতা ও প্রজ্ঞা এবং সহানুভূতি ও সংযুক্তি উভয়ই শর্ত। মানুষতো দুনিয়ার লাভ ও ক্ষতির বিষয়েও ওয়াকিফহাল। দুনিয়ার মাঝেই তার সমূহ প্রয়োজনীয়তা রেখে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই মানুষ দুনিয়ার উত্তম ট্রাস্টি হওয়ার ক্ষমতা রাখে।

উদাহরণ স্বরূপ- কোন লাইব্রেরী বা পাঠাগারের ব্যবস্থাপনা ঐব্যক্তিই ভালোভাবে করতে পারে, যার জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ রয়েছে এবং বই-পত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ও আকর্ষণ জড়িয়ে রয়েছে। যদি কোন পাঠাগারের দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনা কোন মূর্খ লোককে সোপর্দ করা হয়, সে যত সম্ভ্রান্ত লোকই হোক না কেন, সে ভালো লাইব্রেরিয়ান হতে পারবে না। কিন্তু যার জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ রয়েছে, বই-পত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে, সে এর মধ্যে যথেষ্ট সময় ব্যয় করবে, এর সঞ্চয় ভাণ্ডারে যুক্তিসঙ্গত সংযোগ ঘটাবে এবং এর উন্নয়ন সাধন করবে।

এমনিভাবে মানুষ যেহেতু এই দুনিয়ার, এর প্রতি তার আগ্রহও রয়েছে, এর প্রয়োজনও তার রয়েছে; দুনিয়া সম্পর্কে সে অবগতও, এর প্রতি সে সহানুভূতিশীলও, দুনিয়াতে তাকে বসবাসও করতে হবে এবং দুনিয়াতে তাকে মৃত্যুও বরণ করতে হবে, তাই এই দুনিয়ার পরিপূর্ণ দেখাশোনা সে করবে এবং আল্লাহ্র দেওয়া যাবতীয় নেয়ামতের যথার্থ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করবে। ব্যবস্থাপনার কাজ মানুষ ব্যতীত আর কেউ এমন সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতে পারবে না।

দুনিয়ার ব্যবস্থাপনায় মানুষই উপযুক্ত

যখন হযরত আদম (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করলেন এবং দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি বানালেন, তখন ফেরেশতাগণ- যারা পবিত্র ও রূহানী সৃষ্টি, যারা গুনাহ করতেন না, গুনাহ্র আগ্রহও বোধ করতেন না- বললেন হে প্রভু! এমন সৃষ্টিজীবকে আপনার প্রতিনিধি বানাচ্ছেন, যারা পৃথিবীতে খুন-খারাবী করবে। আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং আপনার ইবাদতেই মশগুল থাকি। এই মর্যাদা আপনি আমাদের দিন।' আল্লাহ জবাব দিলেন- তোমরা এ বিষয়ে অবগত নও। আল্লাহ তাআ'লা আদম (আ.) ও ফেরেশ্তাগণের পরীক্ষা গ্রহণ করলেন। যেহেতু আদম (আ.) এই মাটির তৈরী ছিলেন, দুনিয়াটাকে তাঁর ব্যবহার করতে হবে, দুনিয়ার সাথে তাঁর স্বভাবের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য ছিলো, তাই তিনি দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি ঠিক ঠিক উত্তর দিলেন। এসব বস্তুর সঙ্গে ফেরেশ্তাগণের কোন যোগসূত্র ছিলো না, তাই তাঁরা জবাব দিতে পারলেন না।

এভাবেই আল্লাহ্ তাআ'লা দেখিয়ে দিলেন যে, পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা এবং এই ওয়াক্ফের দায়িত্ব বহনের জন্য নিজের সব রকম মানবীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও

মানুষই উপযুক্ত; বরং এইসব দুর্বলতা এবং এইসব মুখাপেক্ষীতাই তাকে এমন মর্যাদার জন্য উপযুক্ত সাব্যস্ত করেছে। যদি এই পৃথিবীতে ফেরেশতাগণ বাস করতেন, তাহলে পৃথিবীর অধিকাংশ নেয়ামতই অর্থহীন প্রতীয়মান হতো এবং পৃথিবীর সেই উন্নতি ও অগ্রগতি কখনো ঘটতো না, যা ঘটিয়েছে মানুষ তার প্রয়োজন ও চাহিদাকে ভিত্তি করে।

সফল স্থলাভিষিক্ত

কিন্তু এ বিষয়টিও আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, নায়েব বা স্থলাভিষিক্তের জন্য ফরয হলো, যিনি স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তার পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। তাকে তার চরিত্রের নমুনা ও প্রতিভূ হতে হবে। আমি যদি এখানে কারো স্থলাভিষিক্ত হই, তাহলে সফল ও বিশ্বস্ত স্থলাভিষিক্ত আমাকে তখনই বলা হবে, যখন আমি আমার সমগ্র সামর্থ ব্যয় করে তার অনুসরণ করবো এবং নিজের মধ্যে তার চরিত্র সৃষ্টি করবো। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব হলো এই যে, আমাদের নিজেদের মধ্যে তাঁর স্বভাব সৃষ্টি হবে এবং তাঁর গুণাবলীর সাথে আমাদের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য ঘটবে। আর আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, তাঁর গুণাবলী ও চরিত্রের মধ্যে রয়েছে প্রজ্ঞা, দয়া, কৃতজ্ঞতা, অনুগ্রহ, পরিচালনা, পবিত্রতা, ক্ষমা ও মার্জনা, দান-দক্ষিণা, ন্যায়পরায়ণতা, হেফাযত ও সংরক্ষণ, ভালোবাসা, কঠোরতা ও মমতা, অপরাধীদের পাকড়াও করা ও শাস্তি দেওয়া, সর্ব বিষয়ে সমন্বয় ও ব্যাপকতা প্রভৃতি।

আল্লাহ্‌র গুণাবলীর প্রকাশ

আল্লাহ্‌র পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে শিখিয়েছেন– তোমরা আল্লাহ্‌র গুণাবলী অবলম্বন করো [تخلقوا باخلاق الله]। মানুষ তার সীমিত মানবীয় গণ্ডির মধ্যে থেকে এবং তার যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতা সাথে নিয়ে আল্লাহ্‌র এইসব আখলাক ও গুণাবলীর প্রতিচ্ছবি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। মানুষ কখনো খোদা হতে পারবে না, কিন্তু পৃথিবীতে খোদার গুণাবলীর প্রকাশ ঘটাতে পারবে, এতে সে সক্ষম। আর সাচ্চা প্রতিনিধির কাজ এটাই। আপনি ভাবতে পারেন– যদি মানুষ প্রকৃতই নিজেকে খোদার প্রতিনিধি মনে করতে থাকে এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে নিজের জীবনের মানদণ্ড বানিয়ে নেয়, তাহলে স্বয়ং তার অগ্রগতি ও উন্নয়ন এবং তার প্রতিনিধিত্বের আমলে পৃথিবীর সুখ ও প্রাচুর্যের রূপ কেমন হবে?

ধর্মতো মানুষের একটি উন্নততর এবং ভারসাম্যপূর্ণ রূপ ও ধারণা (কনসেপ্ট) দান করেছে। ধর্ম মানুষকে আল্লাহ্র প্রতিনিধি, এই যমীন পরিচালনায় আল্লাহ্র স্থলাভিষিক্ত এবং এই মহত্তম ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লী ঘোষণা করেছে। মানুষের সম্মান ও মানবতার উত্থান এর চেয়ে অধিক আর কিছুই হতে পারে না।

বিপরীত দুটি রূপ

কিন্তু মানুষ নিজেই নিজের ব্যাপারে বিপরীতধর্মী দুটি রূপ দাঁড় করিয়েছে। কোথাও তো মানুষকে খোদা বানানো হয়েছে এবং তার উপাসনা শুরু হয়েছে। কোথাও মানুষকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করে নেওয়া হয়েছে এবং গরু-গাধার মতো তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিছু মানুষ নিজেই খোদা সেজে বসেছে এবং কিছু মানুষ নিজেকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট ধরে নিয়েছে। সে মনে করে– আমাদের কাজ শুধু পেটের সঙ্গে জড়িত এবং আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে একটি নফ্স বা রিপু। এই উভয় ধারণাই ভুল ও ভ্রান্তিপূর্ণ বরং সরাসরি জুলুম ও সীমালংঘন।

মানুষ খোদাও নয়, মানুষ পশুও নয়, মানুষ মানুষই। কিন্তু মানুষ হওয়ার কারণেই সে খোদার প্রতিনিধি। সমগ্র জগতটাকে তার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহ্র জন্য। সমগ্র জগত তার সামনে জবাবদিহি করবে, সে জবাবদিহি করবে আল্লাহ্র সামনে। এই যমীন, এই পৃথিবী কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এটি একটি ওয়াক্ফ এবং মানুষ তার মুতাওয়াল্লী। এইরূপ ধারণা এবং এই বিশ্বাস ব্যতীত পৃথিবীর যথার্থ মান নির্ণয় সম্ভব নয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য বিদ্যমান যে, যখন মানুষ এই সঠিক রাস্তা থেকে সরে গেছে, নিজের সীমানা লংঘন করেছে, খোদা সাজার চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে পৃথিবীর আসল মালিক ভেবে নিয়েছে অথবা নিজের অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে নীচে পড়ে গেছে এবং নিজেকে পশু ভেবে নিয়েছে অথবা পৃথিবীর পরিচালনা ও দায়িত্ব থেকে হাত উঠিয়ে- নিয়েছে এবং জীবনের সমূহ যিম্মাদারী ও ফরয পালন না করে পালিয়ে গেছে, তখন সে নিজেও বরবাদ হয়েছে এবং এই দুনিয়াও ধ্বংস হয়েছে।

মানুষের জড় রূপ

আজকের যুগে ইউরোপের হাতে দুনিয়ার লাগাম এবং সে মানবতার লিডার সেজে বসে আছে। সে তো পশুত্বের স্তর থেকেও এক ধাপ সামনে বেড়ে গেছে। সে মানুষকে জড় পদার্থের রূপে উপস্থাপন করেছে। সে বলে থাকে– মানুষ হলো পয়সা ঝরানোর যন্ত্র এবং একটি সফল টাকশাল। তবে, তার মধ্যে রয়েছে চাহিদা ও প্রবৃত্তি; কিন্তু তা স্পষ্টতই পাশবিক। হায়! যদি সে মানুষকে শুধু একটি যন্ত্রই বানিয়ে রাখতো, যার মাঝে কোন প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা শক্তি থাকবে না! জুলুমের চেয়েও অধিক জুলুম হলো, সেখানকার মানুষ একদিকে যন্ত্র হলেও অপরদিকে স্বার্থপর ও নিপীড়নকারী। ইউরোপের এই কর্তৃত্বের যুগে গোটা পৃথিবী একটি প্রাণহীন ফ্যাক্টরীতে পরিণত হতে যাচ্ছে, যেখানে কখনো কখনো বড়ই ভয়ংকর সব দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এই যান্ত্রিক যুগে কোমল মানবিক আবেগ-অনুভুতি, মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং হৃদয়ের ঔদার্য অনুসন্ধান করেও পাওয়া যাচ্ছে না। এই টাকশালে কোথাও আল্লাহ্‌র নাম নেই, আল্লাহ্‌র তলব নেই, অন্তরের বিগলন নেই, চোখে অশ্রু নেই, হৃদয়ে উত্তাপ নেই, মানবিকতার কোমলতা নেই; নেই আত্মা ও প্রাণের স্পন্দন। অথচ যেই হৃদয়ে মহব্বত ও মা'রেফাত নেই, তা তো মানুষের দিল নয়, তাহলো পাথরের শিলা। যেই চোখে কখনো অশ্রু আসে না, তাতো মানুষের চোখ হতে পারে না, তা হলো নার্গিস ফুলের চোখ।

জীবিকার সংকট অথবা আনন্দ-বিনোদন

এখন টাকা, পেট আর স্বার্থ ছাড়া কিছু নেই। আমি নিজের শহরে সকালে হাঁটতে বের হই। লোকজনের বিভিন্ন জমায়েত এবং বন্ধুদের বিভিন্ন বৈঠকের পাশ দিয়ে চলতে হয়। এদিক থেকে দু'জন যায়, ওদিক থেকে চারজন আসে। কিন্তু তখন এসব কথা ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাই না যে, আপনার বেতন কত? আপনার উপরি আয় কি পর্যন্ত হয়? আপনার বদলি কোথায় হচ্ছে? অমুক অফিসারটি বদমেযাজ, অমুক অফিসার খুব ভালো, ছেলের বিয়েতে এত টাকা খরচ হয়েছে, মেয়েকে এ পরিমাণ যৌতুক দিয়েছি, আমার ফান্ডে এত সঞ্চয় রয়েছে, অমুকের ব্যাংকে এ পরিমাণ ব্যালেন্স রয়েছে আর এখন তো ক্রিকেট চর্চার যুগ চলছে। সব জায়গায় ক্রিকেটের আলোচনা, সব জায়গায় খেলোয়াড়দের উপর আলোকপাত। আমি খেলাধুলার বিরোধী নই। নিজেও খেলেছি এবং

খেলার প্রতি রুচিও বোধ করি। ব্যায়াম ও বীরত্বব্যঞ্জক খেলাধুলাকে উপকারী ও আবশ্যকীয় মনে করি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এটাই জীবনের একটি আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকবে এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এর আলোচনায় কোন বিরতি পড়বে না। আপনারা হয়তো শুনেছেন, পাকিস্তানে এই খবর পেয়ে এক লোকের হার্টফেল হয়ে গেছে যে, এক খেলোয়াড় নিরানব্বই রান করে আউট হয়ে গেছে, সেঞ্চুরী করতে পারেনি। আমি কোন কোন সফরে দেখেছি, দুই-তিন ঘন্টা পর্যন্ত অব্যাহতভাবে ক্রিকেট টিম এবং তাদের খেলা নিয়ে আলোচনা চলেছে। এক মিনিটের জন্যও বিষয়বস্তু বদলায়নি। মানুষ! তুমি পৃথিবীকে ক্লাব বানিয়েছ, টাকশাল বানিয়েছ, কারখানা বানিয়েছ, যুদ্ধের ময়দান বানিয়েছ, কিন্তু মানুষের বসতি বানাতে পারো নি।

হৃদয়ের সত্য পিপাসা

আগে প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি শহরে আল্লাহ্‌র এমন কিছু বান্দার সন্ধান পাওয়া যেতো, যাদের মাধ্যমে হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ হতো। জিহবার যেমন পিপাসা জাগে, তেমনি হৃদয়েরও পিপাসা জাগে। জিহবার পিপাসা পানি, শরবত, সোডা, লেবুর দ্বারা নিবারণ করা হয়, আর হৃদয়ের পিপাসা নিবারণ হয় সত্য ও পবিত্র ভালোবাসার কথাবার্তা এবং প্রকৃত প্রেমাস্পদের আলোচনার দ্বারা। টাকা, সম্পদ আর প্রবৃত্তির তাড়নার কথায় হৃদয় উত্তেজিত হয়। বর্তমানে সব জিনিসের দোকান, মেলা ও বাজার বিদ্যমান। সব জিনিসই সহজলভ্য। কিন্তু আত্মা ও হৃদয়ের খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে। বহুদিন ধরে কবি বলে যাচ্ছেন–

'ও জো বেচতে থ দাওয়ায়ে দিল, ও দুকান আপনি বড়হা গায়ে'

[হৃদয়ের ঔষধ বিক্রি করতো যেই দোকান,

আমার সেই দোকানটি এখন জীর্ণ হয়ে গেছে]

আজ খোদার স্মরণ ঘর-বাড়িতে নেই, রেল গাড়িতে নেই। এমনকি মসজিদ-মন্দিরেও প্রভুর স্মরণ সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আজ স্থানে স্থানে রিপু ও প্রবৃত্তি, খানা-পিনার ধ্বনি উচ্চকিত। জীবন-যাপনে অর্থাভাব? এই অভাব পূরণ করে দেয় সিনেমা, যা পাশবিক তাড়না জাগিয়ে তোলার কাজ করে। আত্মা অস্থির; আল্লাহ্‌র বান্দা চলেছে কোথায়? যদি শুধু পয়সা কামানোই মানুষের কাজ

হতো এবং পেট ভরে নেওয়াই তার কর্তব্য হতো, তাহলে এই হৃদয় মানুষকে কেন দেওয়া হলো? বিবেক কেন দান করা হলো? এমনি চঞ্চল ও উচ্চাভিলাষী আত্মা কেন প্রদান করা হলো? এমন তুলনাহীন, বিস্ময়কর ও অভিনব সব যোগ্যতাই তাকে কেন অর্পণ করা হলো?

মানবতার প্রতি মমতা নেই

ইউরোপ মানুষকে ইন্ধন ভেবে নিয়েছে। সে নিজের মান-মর্যাদা ও প্রবৃত্তির অগ্নিকুণ্ডে মানুষকে লাকড়ি ও কয়লার মতো ব্যবহার করছে। আমেরিকা চায়– উত্তর কোরিয়া এবং কমিউনিস্ট চীনে বিক্ষোভ ছড়িয়ে দিতে। রাশিয়া চায়– জাতীয়তাবাদী চীনকে ধ্বংস করে দিতে। গোটা ইউরোপ চায়– দূর প্রাচ্য অথবা মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হোক। মানবতার প্রতি কারো মমতা নেই। কারো হৃদয়ে মানুষের প্রতি সম্মানবোধ নেই।

সবাই আল্লাহ্র রাজত্বের লুণ্ঠনকারী হতে চায়। কেউ খোদার নায়েব হতে চায় না। কেউ নিজেকে এই পবিত্র ওয়াক্ফের মুতাওয়াল্লী মনে করে না।

এশিয়া, আফ্রিকাতেও রাষ্ট্রের ভিত্তি হেদায়াত ও পথ-প্রদর্শনের নীতি, মানুষের সাফল্য ও কল্যাণ, নৈতিক সংশোধন এবং মানবতার উন্নয়নের উপর নেই। সবারই ভিত্তি সম্পদগত উপাদান, আয়ের উপকরণ ও এতদুভয়ের বৃদ্ধি ও সংযোজনের উপর। তাদের কাছে জাতির নৈতিক অবস্থান এবং মানবিক সমস্যাগুলোর কোন গুরুত্ব নেই। এ কারণে আর্থিক ক্ষতি বরদাশত করতে কেউ প্রস্তুত নয়। যদি কোন ভুল প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন বিনোদনমূলক শিল্প থেকে তাদের মোটা আয়ের ব্যবস্থা হয় এবং জাতির কোন শ্রেণী অথবা নতুন প্রজন্মের জন্য তা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, তথাপি তারা আয়ের এই অনৈতিক ব্যবস্থা থেকে হাত গুটিয়ে নিতে প্রস্তুত নয়। এমনকি এ কারণে আগত প্রজন্ম সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলে এবং নৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে গেলেও তাদের কিছুই যায় আসে না।

আমাদের কাজ

বর্তমানে ঈমান, নৈতিকতা এবং মানবতা নির্মাণের কাজ রাষ্ট্রের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না, ছেড়ে দেওয়া যায় না সংস্থা-প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যায়তনগুলির

উপর। এটা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিশ্বজনীন কাজ। এ কাজে আমাদের সকলের প্রচেষ্টা ব্যয় করা উচিৎ। মনে রাখবেন, সাধারণ মানুষ ও সাধারণ জনগণ যে কাজ করতে প্রস্তুত হবে না এবং যে কাজের গুরুত্বের উপলব্ধি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে জাগবে না, সে কাজ যত সহজই হোক, বাস্তবায়িত হবে না। বড় থেকে বড় রাষ্ট্রও সে কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে না। আসলে এর জন্য দরকার ব্যাপক ও গণপ্রচেষ্টার।

পয়গাম্বরগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজের চেষ্টা এবং জনসাধারণের চেষ্টায় বিপ্লব জাগিয়ে তুলেছেন। আমাদের ও আপনাদেরকে তাদের পদচিহ্নের উপর চলেই এই কাজের প্রচেষ্টা শুরু করা উচিত। স্বয়ং নিজের ইসলাহ ও সংশোধন করা উচিৎ এবং ব্যাপক সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো উচিত। এই চেষ্টা করা উচিত যে, মানুষ যেন এই পৃথিবীকে একটি পবিত্র ওয়াক্‌ফ সম্পদ এবং নিজেকে তার দায়িত্বশীল মুতাওয়াল্লী মনে করে। চেষ্টা করা উচিত, মানুষ যেন নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের উপযুক্ত পাত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করে এবং আল্লাহ্‌র নৈতিক গুণাবলী অবলম্বন করে সকল সৃষ্টজীবের প্রতি আচরণ করে। এটাই সংশোধনের পদ্ধতি এবং এরই মাঝে রয়েছে মানুষ ও পৃথিবীর পরিত্রাণ।

বর্তমান সভ্যতার অসফল কাহিনী

[১৯৫৫ ইং সনের ২৪ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় বানারসের ভিক্টোরিয়া পার্কের একটি গণ সমাবেশে ভাষণটি প্রদান করা হয়]

উপাদানের সহজলভ্যতা

এই যুগটি নানা দিক থেকে অত্যন্ত বৈশিষ্টমণ্ডিত। কাজ করার উপকরণ যেভাবে যতটুক এ যুগে সহজলভ্য হয়ে গেছে, কখনো এতটুকু সহজলভ্য ইতিপূর্বে ছিলো না। ইতিহাসের একজন ছাত্র আমি। আমি জানি, এ পরিমাণ উপায়-উপকরণ ইতিপূর্বে কখনো মানুষের সংগ্রহে আসেনি। উপায়-উপকরণের প্লাবন এ যুগের বৈশিষ্ট্য। অধিক থেকে অত্যাধিক এবং উত্তম থেকে অতি উত্তম উপায়-উপকরণ বর্তমানে বিদ্যমান। আমরা লক্ষ্ণৌ থেকে কয়েক ঘন্টা সফর করেই এখানে এসে হাজির হয়েছি। এর চেয়েও দ্রুত গতিসম্পন্ন গাড়ির সাহায্যে এই সফর করা যেতো। বিমানে উড়েও মানুষ এখানে আসতে পারে। আজ থেকে শুধু সত্তর-আশি বছর আগে লক্ষ্ণৌ থেকে যদি কেউ বানারস আসতে চাইতো, তাহলে সে কি উপায় অবলম্বন করতো, আপনি চিন্তা করুন। ভেবে দেখুন– এ পর্যন্ত পৌঁছতে তার কত সময় ব্যয় হতো।

এটাতো সফরের বিষয়। এক যুগ তো এমনও ছিলো যে, মানুষ দূরে অবস্থানকারী বন্ধু-সুহৃদ ও আত্মীয়-স্বজনের খবরা-খবর জানতে ইচ্ছে হলে প্রমাদ গুণতো। কিন্তু আজ দূর-দূরান্তের দেশে বসবাসরত লোকের গলার স্বর আমরা ঘরে বসেই শুনতে পারি এবং এমনভাবে শুনতে পারি, যেন সে মুখোমুখি বসে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। বর্তমানে কয়েক দিনেই দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চিঠি পৌঁছে যায়। টেলিগ্রাম তারও আগে পৌঁছে। এমন এক যুগ ছিলো, সাধারণত যখন কেউ প্রবাসে যেতো, তখন তার প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি থাকতো সন্দেহযুক্ত এবং বলে-কয়ে, ক্ষমা-মার্জনা আদায় করেই যেতে হতো। যদি প্রবাস থেকে কয়েক বছর পর অন্য কেউ ফিরে আসতো এবং প্রবাসী ব্যক্তির খবর জানাতো, তখন আত্মীয়-পরিজন শুকরিয়া আদায় করতো। তা নাহলে

কোন খবরই পাওয়া যেতো না। কিন্তু আজ যদি কেউ দূরতম কোন গন্তব্যেও সফরে বের হয়, যে কোন জায়গা থেকে নিজের খবরা-খবর আত্মীয়-পরিজনকে জানাতে পারে এবং খুবই সহজে অত্যন্ত অল্প সময়ে ফিরে আসতে পারে।

আজ উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য এমন যে, আপনি লণ্ডনের আওয়াজ এখানে বসে বসে শুনতে পারবেন। নিউইয়র্কে কোন মানুষ আলোচনা করলে বা ভাষণ দিলে আপনি এখানে বসে বসে তার আওয়াজ শুনতে পারবেন, তাকে দেখতে পারবেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এমন কথা বললে, সেটা বুঝাও দুরূহ হয়ে যেতো। কিন্তু আজকে যদি কেউ এসব আবিষ্কারের ব্যাপারে সন্দেহ ব্যক্ত করে, তাহলে শিশুরাও তাকে বিদ্রুপ করবে। টেলিফোন, টেলিভিশন, ওয়্যারলেস, রেডিও এবং যাবতীয় আবিষ্কৃত উপকরণের দিকে আপনি লক্ষ করে দেখুন যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদেরকে কত কিছু উপহার দিয়েছে। আমাদের অন্তরে বার বার এই আক্ষেপ আর বেদনা জেগে উঠে, আহা! যদি এই যুগে সৎ হওয়ার আগ্রহ, আল্লাহপ্রেমী হওয়ার প্রেরণা, দয়ার্দ্রতা, মানবিক সহমর্মিতা ও পারস্পরিক মমতার বন্ধনও বজায় থাকতো এবং এইসব নব আবিষ্কৃত উপকরণের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার ঘটতো, তাহলে এই পৃথিবী জান্নাতের নমুনা হয়ে যেতো। থেমে থেমে আমাদের হৃদয়ে একটি দুঃখ, একটি ব্যথা জেগে উঠে– হায়! কাজের উপায়-উপকরণের তো এ বিশাল প্লাবন, কিন্তু এই উপায়-উপকরণের সাহায্যে কর্ম সম্পাদনকারীর এমন মহামারী!

এখন আপনার উপায়-উপকরণ খুঁজে ফেরার প্রয়োজন নেই। উপায়-উপকরণ নিজেই আপনাকে তালাশ করে চলেছে। এখন বাহন নিজেই মুসাফিরকে খুঁজে ফিরছে এবং প্রতিযোগিতা করছে। আজ রেলওয়ের পক্ষ থেকে টাইম-টেবিল প্রচার করা হচ্ছে। ভ্রমণে উৎসাহ যোগানোর জন্য প্রচার করা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর স্থান এবং ঐতিহাসিক শহরগুলির ছবি। যেন ভ্রমণের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি হয়– সেজন্যই এসব করা হচ্ছে। বিমান কোম্পানীগুলি বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ষ্টেশনে গাড়ী থেকে নামতেই হোটেলওয়ালাদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো তারা ছায়ার মতো সঙ্গে লেগে থাকছে এবং তাদেরকে ছাড়ানোও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। অথচ এমন এক সময় ছিলো যে, মুসাফির পথে পথে ঘুরে সরাইখানা খুঁজতো এবং সওয়ারী ও বাহনের সন্ধানে বের হওয়ার দরকার হয়ে পড়তো। আজ এই চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও শুভ প্রেরণার বিলুপ্তি

যে পরিমাণ দ্রুততার সাথে উপায়-উপকরণ উন্নতি করেছে, আমাদের নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ব কিন্তু সে পরিমাণ উন্নতি করেনি। একজন মানুষের এ অবস্থা দেখে দুঃখ হয় যে, আগের যুগের মানুষ ভালো ও কল্যাণ সাধন করতে চাইতো, তাদের কাছে উপায়-উপকরণ ছিলো না। কিন্তু এখন উপায়-উপকরণ বিদ্যমান, কল্যাণের প্রেরণাই অন্তর থেকে চলে যাচ্ছে। এ অবস্থার একটি পরিষ্কার উদাহরণ আমি তুলে ধরছি। আগের যুগে একটি দরিদ্র পরিবারের লোক উপার্জনের জন্য প্রবাসে পাড়ি দিতো। সে যা কিছু কামাই করতো, বাড়িতে পাঠানো কঠিন হয়ে যেতো। হয় তার নিজেকেই বাড়ি ফিরে আসতে হতো, অথবা ভাগ্যগুণে ফিরতি পথের কোন বিশ্বস্ত লোককে পেতে হতো। সে সবসময় এ বিষয়ে চিন্তিত থাকতো। তার হৃদয়ে জেগে উঠতো নিজের পরিবারের লোকদের দুঃখ-দুর্দশা এবং শিশুদের ক্ষুধার যন্ত্রণা ও কান্নাকাটির কথা। কিন্তু সে কিছুই করতে পারতো না। না ছিলো পোস্ট অফিস, না ছিলো বহন ও যোগাযোগের সহজ ব্যবস্থা। কিন্তু এখন শহরে-শহরে, পাড়ায়-পাড়ায় পোস্ট অফিস চালু আছে। টাকা-পয়সা মানিঅর্ডারের সাহায্যে পাঠানো যায়, তার করেও পাঠানো যায়। কিন্তু উপার্জনকারীর অন্তরে এখন টাকা পাঠানোর প্রেরণা, পরিবারের লোকদের দুর্দশা এবং গাঁয়ের লোকদের দারিদ্রের অনুভূতিই নেই। সিনেমা, পার্ক, খেলা, তামাশা এবং হোটেল-রেস্টুরেন্ট ঘুরে কিছু আর বাঁচেই না যে, সে ঘরে পাঠাবে।

পোস্ট অফিসের কাজ হলো, যদি কেউ টাকা পাঠায়, তাহলে তা পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু কেউ পাঠাতেই না চাইলে পোস্ট অফিস কিছুই করতে পারবে না। পোস্ট অফিসের কাজ– নৈতিকতার শিক্ষা দান এবং কল্যাণের প্রতি উৎসাহ যোগানো নয়। আগের কালের প্রবাসী উপার্জনকারীরা নিজের পেট ভরতেও কষ্ট করতো। সকল উপার্জন দরিদ্র পরিবারের লোকদের এবং গাঁয়ের অভাবী মানুষদের জন্য পাঠিয়ে দিতো। আজ টাকা পাঠানো এবং সাহায্য করার সব উপায়-উপকরণ তো বিদ্যমান; কিন্তু মানুষের অভ্যন্তরে দরিদ্র ও গরীব মানুষকে সাহায্য করার প্রেরণা নেই। সাহায্য করার চাহিদা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের সংস্কৃতিতে এর কোন স্থান নেই। তবে এই উপায়-উপকরণ আর কী কাজে আসবে?

উপকরণের সহজলভ্যতা সুপ্রবৃত্তি লালন করে না

উপায়-উপকরণ-আবেগ, সুপ্রবৃত্তি ও সদিচ্ছাকে লালন করে না। আজ মানিঅর্ডার রয়েছে, তার রয়েছে, সহজ যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে, বিত্তের প্রাচুর্য রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাধির চিকিৎসা কী যে, গরীবদের সাহায্যের মনোভাব এবং স্বভাবের মধ্যে মানব সেবার চাহিদাই নেই? পৃথিবীর কোন প্রতিষ্ঠান এই চাহিদা সৃষ্টি করতে পারবে? এমন অবস্থায় উপায়-উপকরণ কী সাহায্য করতে পারে?

আমি এরই দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। আপনারা প্রাচীন বই-পুস্তক উল্টিয়ে দেখুন। দেখতে পাবেন– আল্লাহ্র অনেক বড় বড় নেক বান্দা এই আশা বুকে নিয়েই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন যে, আল্লাহ্ যদি তাঁকে হজ্ব করার সৌভাগ্য দান করতেন! তাঁরা তীব্র ভালোবাসা ও আগ্রহের কারণে হাজারো কবিতা আবৃত্তি করেছেন এবং বহু নিবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু তাদের এই আশা পূরণ হয়নি। কেননা, তাঁদের কাছে এ পরিমাণ টাকাও ছিলো না এবং সফরের এমন সহজ ব্যবস্থাও ছিলো না। মনে করুন– টাকাও রয়েছে, সফরের সব সহজ ব্যবস্থাও রয়েছে, কিন্তু হজ্বের আগ্রহ ও চাহিদাই অন্তরে নেই, তাহলে বলুন, এই উপায়-উপকরণ কি করতে পারে? আগের যুগে মানুষ কাশি, গয়া ও মথুরা যাত্রার জন্য হাজার মাইল পায়ে হেঁটেই চলে যেতো এবং সফরের দুর্ভোগ বরণ করে নিতো। মনে করুন– এখন সফরের সব সহজ ব্যবস্থা রয়েছে, দ্রুতগতিসম্পন্ন বাহন রয়েছে, কিন্তু এসব স্থানে যাওয়ার আগ্রহ ও আবেগ ফুরিয়ে গেছে। তাহলে এই উপায়-উপকরণ কি করতে পারবে?

উপকরণের পূর্বে ব্যবহারকারী দরকার

পয়গাম্বরগণ এ বিষয়টি বুঝতেন যে, উপায়-উপকরণের পূর্বে উপকরণ ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অধিক। আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁদেরকে ঈমানী প্রজ্ঞা এবং নবুওয়াতের নূর দান করে সুষ্ঠু ব্যবহারকারী সৃষ্টি করেছেন। বাহন ও সওয়ারী সৃষ্টির আগে বাহন দ্বারা উপকার ও সুবিধা ভোগকারী এবং সৎ উদ্দেশ্যে সফরকারী সৃষ্টি করেছেন। অর্থ উপার্জনের পূর্বে সঠিক পাত্রে অর্থব্যয়কারী এবং সঠিক পন্থায় অর্থ ব্যবহারকারী সৃষ্টি করেছেন। উপকরণ সৃষ্টি করার আগে নিজস্ব শক্তি ও খোদাপ্রদত্ত নেয়ামতের ব্যবহার শিখিয়েছেন। তাঁরা মানুষের মাঝে সুপ্রবৃত্তির জন্ম দিয়েছেন। সুপ্রবৃত্তির এমনিতেই জন্ম হয় না, একীন ও আকীদার মাধ্যমে তার জন্ম হয়। একীন সুপ্রবৃত্তির সৃষ্টি করে। সুপ্রবৃত্তি আমলের আগ্রহ সৃষ্টি

করে। অবশেষে উপকরণ দ্বারা আমল সংঘটিত ও বাস্তবায়ীত হয়। উপায়-উপকরণ এবং মানবীয় প্রচেষ্টার ফলাফল সবসময় মানুষের ইচ্ছার অনুগত থাকে। সৎ প্রবৃত্তি এই জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি ও সম্পদ। কিন্তু পৃথিবীর বড় বড় দার্শনিক নেতা ও বিজ্ঞানী এই সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুধাবনে অপারগ ছিলেন। এটা শুধু আল্লাহ্র পথ প্রদর্শন এবং পয়গাম্বরগণের সূক্ষ্মদর্শিতা ছিলো যে, তাঁরা প্রথমে সৎ প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৎ, অপরের প্রতি সহমর্মী এবং কল্যাণপ্রেমী বানিয়েছেন। উপকরণ ছিলো তাঁদের পায়ের নিচে এবং তাঁদের সুপ্রবৃত্তির পিছে পিছে। তাঁদের মস্তিষ্ক সঠিক পথ-প্রদর্শন থেকে সরে যেতো না। তাঁরা মানুষের হৃদয় বানাতেন, মানুষের মানসিকতা গড়তেন। আল্লাহ্র পয়গাম্বরগণ পৃথিবীকে বিজ্ঞান উপহার দেননি, মানুষ উপহার দিয়েছেন।আর মানুষই হচ্ছে এই পৃথিবীর মূল প্রতিপাদ্য।

পয়গাম্বরগণ মানুষ গড়েছেন

পয়গাম্বরগণ এমন মানুষ নির্মাণ করেছেন, যারা নিজেদের রিপু ও প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। তাঁরা উপকরণের পরিবর্তে প্রবৃত্তিকে বিশুদ্ধ করণের মধ্য দিয়ে মানবতার সেবা করতেন। তাঁদের বিশুদ্ধকৃত মানুষদের মধ্য থেকে কেউ কেউ এমন ছিলেন, দুনিয়ার সর্বোচ্চ আয়েশ-বিলাসিতার সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণ যাদের আয়ত্বে ছিল। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। তাঁরা রাজকীয় জীবন যাপনের ক্ষমতা রাখতেন। কিন্তু তাঁরা দুনিয়া ত্যাগ ও অল্পে তুষ্টির জীবন কাটিয়েছেন।

হযরত উমর (রা.)-এর আয়ত্বে এমনসব উপকরণ ছিলো, রোমের সম্রাটরা যেসব উপকরণের সাহায্যে আয়েশ ও বিলাসিতার যিন্দেগী যাপন করেছে। তাঁর কজায় ঐসব উপকরণও ছিলো, যেগুলোর সাহায্যে ইরানের শাহানশাহ বিলাসিতার এমন চূড়ান্ত নিদর্শন স্থাপন করেছে, পৃথিবীর অল্প সংখ্যক বাদশাহ যা করতে পেরেছে। হযরত উমর (রা.)-এর পায়ের নিচে ছিলো গোটা রোমান সাম্রাজ্য, ছিলো সমগ্র ইরান। মিশর ও ইরাকের মতো আসবাব-উপকরণসমৃদ্ধ ও স্বর্ণ প্রসবিনী রাষ্ট্রগুলিও ছিলো তাঁর কজায়। ভারতের নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত তাঁর সেনাশক্তি আগমন করেছিলো। এশিয়া মাইনরের বেশ কিছু অঞ্চল তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিলো। এমন একজন ব্যক্তি বিলাসিতা করতে চাইলে, তাঁর কি কোন ঘাটতি হতো?

কিন্তু তিনি এই বিশাল রাজত্ব এবং এই ব্যাপক উপকরণের সাহায্যে কোন ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণ করেননি। তাঁর সাদামাটা জীবনের অবস্থা এমন ছিলো যে,

দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ঘি ব্যবহার করাও ত্যাগ করেছিলেন এবং তেল খেতে খেতে তাঁর লাল-শুভ্র বর্ণের ত্বক শ্যামবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি নিজের উপর এমনই সংযম আরোপ করেছিলেন যে, লোকজন বলাবলি করছিলো, যদি এই দুর্ভিক্ষ দ্রুত শেষ না হয়, তাহলে উমর (রা.)কে আর জীবিত দেখা যাবে না।

তাঁরই অনুরূপ নামের অধিকারী আরেকজন, উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.), তাঁর চেয়েও বড় রাজত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অবস্থা এমন ছিলো যে, শীতকালে রাষ্ট্রীয় অর্থে মুসলিম জনসাধারণের জন্য যে পানি গরম করা হতো, তিনি নিজের বেলায় সে পানি নিয়ে গোসল করা অনুচিত মনে করতেন। এক রাতে তিনি রাষ্ট্রীয় কাজ করছিলেন। এক ব্যক্তি এসে তাঁকে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা শুরু করলো। তিনি বাতি নিভিয়ে দিলেন; সে বাতিতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের তেল খরচ হচ্ছিলো; যেন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এমন আলাপচারিতায় রাষ্ট্রের তেল ব্যয় না হয়। যদি তিনি বিলাসিতা করতে উৎসাহী হতেন, তাহলে গোটা পৃথিবীর বিলাসী মানুষ তাঁর কাছে পরাজিত হতো। কেননা তিনি সব ধরনের উপায়-উপকরণের মালিক ছিলেন এবং সমকালীন সভ্য জগতের সবচেয়ে বড় রাজত্বের শাসক ছিলেন। এটা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা; যার ফলে এতসব উপায়-উপকরণ সত্ত্বেও তাঁদের নির্মোহ, সাদামাটা জীবনে কোন রদ-বদল ঘটেনি।

ইউরোপের অসহায়ত্ব ও লক্ষ্য-শূন্যতা

বর্তমানে ইউরোপের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব এটাই যে, তার কাছে উপায়-উপকরণের বিস্তৃত ভাণ্ডার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সে সৎ প্রবৃত্তি ও সৎ প্রেরণা থেকে শূন্য হয়ে আছে। সে একদিকে উপায়-উপকরণে কারুণ সদৃশ, অপরদিকে পুণ্যময় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে নিতান্ত দরিদ্র ও মিসকিন। সে জগতের রহস্য উন্মোচন করেছে এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের দাস বানিয়েছে। সে সমুদ্র ও শূন্যে কর্তৃত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু সে নিজের নফস ও প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সে এই জগতের নানা গ্রন্থি উন্মোচন করেছে কিন্তু নিজের জীবনের প্রাথমিক পাঠই অনুধাবন করতে পারেনি। সে বিক্ষিপ্ত অংশ ও প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এই জড় জগতের মাঝে বিপ্লব সাধন করেছে, কিন্তু নিজের জীবনের বিক্ষিপ্ততা দূর করতে পারেনি। কবির ভাষায়—

সূর্যের আলোকে বন্দী করেছে
জীবনের অমানিশাকে পারেনি ভোর করতে
নক্ষত্রের কক্ষপথ অনুসন্ধানী
আপন চিন্তার জগতে তার, শেষ করতে পারেনি সফর।

আহা! ইউরোপের কাছে এই ব্যাপক উপকরণ না থেকে যদি শুভ প্রেরণা ও মানবতার সেবার যথার্থ অনুভূতি থাকতো!

উপকরণ ধ্বংসের কারণ কেন?

মস্তিষ্কের বক্রতা এবং নিয়তের অসততা এসব উপায়-উপকরণকে মানবতার জন্য বিপজ্জনক বানিয়ে দিয়েছে। এক ব্যক্তি– যার অন্তর দয়াশূন্য এবং অত্যাচারী– যদি তার হাতে ধারালো ছুরি থাকে, তবে সে অধিক ক্ষতি করবে। পক্ষান্তরে ভোঁতা ছুরি থাকলে ক্ষতি কম করবে। সভ্যতা উন্নতি করেছে। কিন্তু মানুষের চরিত্র উন্নতি করেনি। যার ফল হলো এই যে, আধুনিক উপকরণ মানুষের জন্য পীড়াদায়ক হয়ে গেছে। দ্রুতগামী বাহনগুলি এখন জুলুমের গতিকে দ্রুত করে দিয়েছে এবং অত্যাচারীকে চোখের পলকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পৌঁছার সুবিধা করে দিয়েছে। আগের যুগে অত্যাচারীরা গরুর গাড়িতে চড়ে যেতো এবং জুলুম করতো। তাদের পৌঁছতে যে পরিমাণ বিলম্ব হতো, জুলুম সংঘটিত হতেও সে পরিমাণ বিলম্ব হতো। ফলে দুর্বল লোকদের জন্য আরো কিছুদিন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ এবং আরামের সাথে জীবন যাপনের সুযোগ ঘটতো। যুগ তো এগিয়ে গেছে। নতুন যুগের অত্যাচারী দ্রুত থেকে দ্রুতগামী বাহনে চড়ে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সহজভাবেই পৌঁছে যাচ্ছে। এভাবে দুর্বল জাতি-গোষ্ঠীর উপর আগ্রাসন চালাচ্ছে এবং মুহূর্তের মধ্যেই তাদেরকে নিঃশেষ ও বিলুপ্তির ঘাটে নামিয়ে দিচ্ছে।

নতুন সভ্যতার ব্যর্থতা

ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় চিন্তাশীলরা এখন একথা স্বীকার করতে শুরু করেছেন যে, নতুন সভ্যতা উপায়-উপকরণ দিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দিতে পারেনি। উদ্দেশ্যহীন উপকরণ অচল। এশিয়ার অধিবাসী হিসাবে আমরা ইউরোপকে বলতে পারি, তোমাদের উপকরণ, তোমাদের অগ্রগতি, তোমাদের আবিষ্কার অসম্পূর্ণ, ব্যর্থ। শত উপকরণ একটি মাত্র উদ্দেশ্যকেও জাগাতে পারে না। তোমাদের সভ্যতা, তোমাদের জীবন-দর্শন, তোমাদের অগ্রগতি শুভ উদ্দেশ্য ও সুকুমারবৃত্তি জন্মানোর ব্যাপারে ব্যর্থ। তোমরা এখন ভালো থেকে ভালো

কাজের উপকরণ সৃষ্টি করতে পার বৈকি, ভালো কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করতে পার না। প্রেরণার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। তোমাদের উপকরণ ও আবিষ্কারের সে পর্যন্ত দৌড়ই নেই। আর যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো কাজের প্রেরণা সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো কাজের সরঞ্জামগত সুবিধা কিছুই করতে পারবে না।

ভালোকাজের প্রেরণা এবং তার তীব্র তাগাদা সৃষ্টি করা ছিলো পয়গাম্বরগণের কাজ। আজও পর্যন্ত তাঁদের শিক্ষাই এই প্রেরণা সৃষ্টির একমাত্র পথ। তাঁরা অনেক উঁচু মাপের প্রেরণা সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন। লক্ষ মানুষের হৃদয়ে নেক কাজের চাহিদা, খেদমতের জযবা এবং অবিচার ও অকল্যাণের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের সীমিত উপকরণ দিয়ে সেই কাজ করে দেখিয়েছেন, ব্যাপক ও বিস্তৃত উপকরণ দিয়েও যে কাজ আজ আর সংঘটিত হচ্ছে না।

ধর্মের কাজ

এ যুগের অনেক ভাই-ই মনে করে থাকেন যে, ধর্মের কাছে কোন পয়গাম নেই এবং ধর্ম এ যুগের কোন সেবা করতে পারবে না। কিন্তু আমি এর প্রতিবাদ করছি এবং চ্যালেঞ্জ করছি যে, ধর্ম আজও ইউরোপকে পথ দেখাতে পারে। সঠিক ও শক্তিশালী তো ধর্মই, যা কল্যাণের প্রেরণা ও নেক কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে। আর এটাই তো যিন্দেগীর চাবিকাঠি। আজ পৃথিবী ভীষণ বিক্ষিপ্ততায় নিমজ্জিত। ইউরোপের কাছে উপকরণ রয়েছে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই। যদি উপকরণ ও উদ্দেশ্যে সমন্বয় ঘটে যেতো, তাহলে পৃথিবীর চিত্রই পাল্টে যেতো।

উপকরণের আধিক্য থেকে দাসত্ব

আজ এই সভ্যতা এ পরিমাণ উপকরণ সৃষ্টি করেছে যে, তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্র নেই। উপকরণ এখন নিজের জন্য বাজার খুঁজে ফিরছে। এই তালাশ ও অনুসন্ধান বহু জাতিকে দাস বানাতে এবং স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে নিজের ব্যবসার বাজার বানাতে উদ্বুদ্ধ করছে। কখনো কখনো তার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন পড়ে যাচ্ছে, যেন এসব নতুন নতুন অস্ত্রের ঠিকানা হয়ে যায়। বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তিই দাঁড় করিয়েছিলো স্বার্থপর অস্ত্রনির্মাতা এবং অস্ত্রের কারখানা-মালিকরা, যারা নিজেদের পণ্যের ক্ষেত্র লক্ষ্য করছিলো যুদ্ধের মধ্যেই।

এশিয়ার কর্তব্য

এশিয়ান রাষ্ট্রগুলির কর্তব্য ছিলো যে, তারা ইউরোপের পণ্যের বাজার হওয়া এবং ইউরোপিয়ান উপকরণ ও পণ্যের মোড়ক উন্মোচনের পরিবর্তে এই নাজুক

সময়ে ইউরোপের সাহায্য করবে, তাদের মাঝে নৈতিকতার প্রেরণা সৃষ্টির চেষ্টা করবে। কেননা এশিয়ানদের কাছে ধর্মের শক্তি রয়েছে এবং বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে ইউরোপ এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হলো, এশিয়ান রাষ্ট্রগুলি নিজেরাই এখন এসব নৈতিক প্রেরণা এবং মানবিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে দেউলিয়া হতে চলেছে। এরা নিজেরাই এখন ইউরোপের ব্যাধির শিকারে পরিণত হচ্ছে। এসব রাষ্ট্রে আত্মবিস্মৃতি ও স্বার্থপরতার অভিশাপ ছড়িয়ে পড়ছে এবং সম্পদ বানানোর একটি উন্মাদনা সওয়ার হয়ে গেছে। এসব রাষ্ট্রের সমাজ গুলিতে এখন পচন ধরে গেছে। এগুলি এসব রাষ্ট্রের জন্য বড়ই ভয়ংকর। সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, রাষ্ট্রের কোন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এই বিপদকে অনুভব করতে পারছে না এবং চরিত্রের সংশোধন, ঈমান-একীনের দা'ওয়াত ও চরিত্র নির্মাণের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে না। অথচ এই কাজ সকল কাজের উপর অগ্রগণ্য ছিলো এবং প্রত্যেক গঠনমূলক কাজের পূর্ণতা এরই উপর সীমাবদ্ধ।

সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ

এই কথাগুলি তো সারা বছরের জন্য যথেষ্ট। এই আশাবাদ নিয়েই আমি কথাগুলি বলছি যে, হয়তো কোন একজন জাগ্রত-মস্তিষ্ক, জীবন্ত-হৃদয় ও সুস্থ চিন্তার অধিকারী মানুষ আমার কথাগুলি মেনে নিবেন। মুখে বলা ও বাস্তবে করার কাজ তো এটাই যে, পয়গাম্বরগণের পথ অবলম্বন করুন! আল্লাহর অস্তিত্বের একীন এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের একীন সৃষ্টি করুন! জীবন-যাপনে আল্লাহর আনুগত্য অবলম্বন করুন! যাদেরকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দিয়েছেন, সম্পদ দিয়েছেন, উপকরণ দিয়েছেন, তারা দুনিয়ার পুণ্যময় জীবন যাপনের চেষ্টা করুন! প্রজ্ঞা ও চরিত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করুন! প্রজ্ঞা আর বচন হবে ঋষিদের, কাজ আর চরিত্র হবে রাক্ষসের– এ কেমন ইনসানিয়াত?

যতক্ষণ পর্যন্ত উপকরণ ও উদ্দেশ্যের মাঝে সমন্বয় এবং ইলম ও চরিত্রের মাঝে সামঞ্জস্য না ঘটবে, এই পৃথিবী এভাবেই ধ্বংস হতে থাকবে। উপকরণ আপনি ইউরোপ থেকে পেতে পারেন। আমি তা গ্রহণ করতে মানা করছি না। কিন্তু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কল্যাণমূলক প্রেরণা ও সুস্থ চাহিদা আপনি একজন পয়গাম্বর থেকেই পেতে পারেন। আপনার জন্য তাঁর কাছ থেকে উপকার গ্রহনের সুযোগ সবসময় বিদ্যমান। তাঁর কাছ থেকে একীনের সম্পদ ও কল্যাণের প্রেরণা নিয়ে আপনি নিজের যিন্দেগীও গড়তে পারেন এবং ইউরোপকেও বাঁচাতে পারেন এই ধ্বংস থেকে, যা তার মাথার উপর এবং তার মধ্যস্থতায় গোটা দুনিয়ার মাথার উপর এই মুহূর্তে ঝুলে আছে।

প্রবৃত্তিপূজা নাকি খোদার দাসত্ব

[১৯৫৪ ইং সনের ২৮ নভেম্বর রাতে আমীনুদ্দৌলা পার্কে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে ভাষণটি প্রদান করা হয়। ব্যাপক সংখ্যক অমুসলিমের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ সহ দশ-বার হাজার লোকের এক সমন্বিত সমাবেশে এই ভাষণটি ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে।]

সোজাসাপ্টা কথা

আমি আপনাদের সাথে এখন কিছু অন্তরের কথা বলতে চাই। এমনভাবে কথাগুলো বলতে চাই যে, যেন আপনাদের প্রত্যেকের সাথেই একাকী বসে কথা বলছি। বাস্তবেই যদি এটা সম্ভব হতো যে, আপনাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক বন্ধুর সাথেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কথা বলতে সক্ষম হতাম, তাহলে অবশ্যই তা-ই করতাম যেন বক্তৃতা মনে না করে আমার কথাগুলো কোন একজন বন্ধুর হৃদয়ের ব্যথা মনে করে আপনারা শোনেন। কিন্তু আমি কী করতে পারি, এমন তো বাস্তবে সম্ভব নয়। যদি এমনটি সম্ভব হতো, তাহলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অবশ্যই এর উপর আমল করতো। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষ্যে তারা কোন সভা অনুষ্ঠান করতো না।

কারণ, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে নির্বাচনী সভাগুলোতে সেই কথাগুলিই বলতে হয়, যে কথাগুলি কাউকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে বলাটাই বেশী উপযোগী। অর্থাৎ নিজের গুণ-গান বর্ণনা করা, নিজের যোগ্যতার প্রচার করা এবং নিজের শানে নিজেই কাব্য রচনা করার কাজই তারা করে। তাই আমি আপনাদের কাছে এতটুকুই আবেদন করতে পারি যে, দয়া করে আমার নিবেদন গুলিকে আপনারা কোন মঞ্চের বক্তৃতা মনে না করে অন্তরের কথা মনে করে শুনবেন।

প্রবৃত্তিপূজা নাকি আল্লাহ্‌প্রেম

দুনিয়ায় জীবন যাপনের বহু পদ্ধতি ও ধারা চালু রয়েছে। মনে করা হয়ে থাকে যে, জীবনের বহু প্রকার রয়েছে। প্রাচ্যের জীবন, পাশ্চাত্যের জীবন,

আধুনিক জীবনধারা, প্রাচীন জীবনধারা ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে জীবনের মৌলিক প্রকার মাত্র দুটি। একটি হলো– রিপু ও প্রবৃত্তিপূজারী জীবন, অপরটি আল্লাহ্‌প্রেমী জীবন। অন্য যেসব প্রকার যেসব বিচিত্র নামে প্রসিদ্ধ, সেগুলোও এই মৌলিক দুই প্রকার জীবনেরই শাখা-প্রশাখা।

প্রথম প্রকার জীবনের বৈশিষ্ট হলো এই যে, মানুষ নিজেকে নিজে লাগামহীন উট মনে করে জীবন যাপন করে এবং মনে যা আসে তাই করে বসে। এই জীবনকে মনচাহি জীবনও বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার জীবন হলো এমন ব্যক্তিদের জীবন, যারা বিশ্বাস রাখে যে, তাকে কেউ সৃষ্টি করেছে এবং সেই সৃষ্টিকর্তাই তার জীবনের মালিক ও শাসক। তিনিই তার প্রয়োজন, সুবিধা ও উপযোগিতা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত। সেই সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে জীবন-যাপনের এমন কিছু নিয়ম-নীতি ও ধারা রয়েছে, যার অনুসরণ করা অপরিহার্য।

প্রবৃত্তিপূজার প্রাধান্য

হিন্দুস্থানে 'মহাভারত' নামে অনেক বড় একটি ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব হয়েছে। মহাভারতের ঐতিহাসিক বিবেচনা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। কিন্তু এই পৃথিবীতে অন্য একটি মহাভারতের সন্ধান পাওয়া যায়। এটি হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ মহাভারত থেকেও অধিক প্রাচীন। এটি সেই দ্বন্দ্ব, যা খোদাপ্রেম ও প্রবৃত্তিপূজার মাঝে সর্বদাই বিরাজমান। এই দ্বন্দ্ব কোন একটি রাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রে এই দ্বন্দ্ব পৌঁছে গেছে। এই দ্বন্দ্ব শুধু যুদ্ধের ময়দানেই সীমিত নেই। বরং বাড়ী-ঘরেও এই দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এটি মূলত জীবনের দুটি ধারা, যা সর্বদা একে অপরের উপর জয়ী হওয়ার চেষ্টা করে আসছে। হযরত পয়গাম্বরগণ নিজ নিজ সময়ে প্রত্যেক স্থানে খোদাপ্রেমী জীবনের দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। তাঁদের সফলতার যুগে সেই প্রকার জীবনেরই প্রাবল্য ছিলো। কিন্তু প্রবৃত্তিপূজা স্থায়ীভাবে কখনো বিলুপ্ত হয়নি। যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখনই সে জীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের যুগ হলো সেই যুগ, প্রবৃত্তিপূজা যেই যুগে সম্পূর্ণভাবে জীবনের উপর চেপে বসে আছে। জীবনের প্রতিটি শাখা, প্রতিটি ময়দান তার গ্রাসে পরিণত হয়ে গেছে। বাড়ী-ঘরে প্রবৃত্তিপূজা, হাট-বাজারে প্রবৃত্তিপূজা, অফিস-আদালতে প্রবৃত্তিপূজা, কল-কারখানায় প্রবৃত্তিপূজা, যেন এটি এমন এক সমুদ্র, যা গোটা স্থলভাগ প্লাবিত করে ফেলেছে এবং আমরা তাতে গলা পর্যন্ত ডুবে আছি।

প্রবৃত্তিপূজা স্বতন্ত্র একটি ধর্ম

প্রবৃত্তিপূজা বর্তমানে স্বতন্ত্র একটি ধর্মে পরিণত হয়ে গেছে। না, শুধু এতটুকুই নয়, বরং এর ধরণটা সবসময় এমনই হয়ে থাকে এবং এই ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা থাকে সবচেয়ে বেশী। অন্য সকল ধর্মের তালিকায় এই নামের কোন ধর্মের উল্লেখ করা হয় না এবং এই নামের ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যারও কোন গণনা করা হয় না। কিন্তু স্ব স্ব ক্ষেত্রে এটাই পূর্ণ বাস্তবতা যে, এই গুপ্ত ধর্মই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্ম। আর এই ধর্মের অনুসারীরাই বিদ্যমান সর্বাধিক সংখ্যক। আপনাদের সামনে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা-শুমারি এভাবে এসে থাকে যে, খৃষ্টান ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা এত, ইসলামের অনুসারী এত এবং হিন্দু ধর্মের অনুসারী এত। তবে, এদের সকলের মধ্য থেকেই একটি বড় সংখ্যা সেই সব লোকের, যারা বলে থাকে আমি ধর্মের পরিচয়ে খ্রীষ্টান, হিন্দু অথবা মুসলমান। কিন্তু মূলত তারা সেই প্রবৃত্তিপূজারী ও আত্মপূজার ধর্মেরই অনুসারী।

প্রবৃত্তিপূজা ও আত্মপূজার জীবনের প্রচলন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা শুধু এ কারণেই যে, এতে মানুষ মজা বেশী পায়। মানলাম– প্রবৃত্তিপূজার জীবন বড়ই মজার ও সুখের জীবন এবং প্রত্যেক মানুষের স্বভাবজাত চাহিদাও থাকে সুখ উপভোগ করা, কিন্তু যদি পৃথিবীর সকল মানুষকে সামনে নিয়ে ভেবে দেখা হয়, তাহলে এ ধরনের জীবন পৃথিবীর জন্য একটি অভিশাপ বৈ অন্য কিছু নয়। পৃথিবীর সকল যন্ত্রণা, সকল দুঃখ এই প্রবৃত্তিপূজারই ফল। পৃথিবীর সমস্ত ধ্বংস, সমস্ত সংকট, সমস্ত অনাচারের দায় সেইসব লোকের উপরই বর্তায়, যারা এই অপয়া ধর্মের অনুসারী।

এই পৃথিবীতে প্রবৃত্তিপূজার এই ধর্মের অবকাশ কেবল সেই অবস্থাতেই ঘটতে পারে, যখন গোটা পৃথিবীতে শুধু একজন মানুষেরই অস্তিত্ব থাকে। শুধু সেই অবস্থাতেই সে নিজের মনের বাসনাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পূরণ করার অধিকার অর্জন করে। কিন্তু বাস্তবতা তো এমন নয়। এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এখানে কোটি কোটি মানুষের বসতি বানিয়েছেন এবং তাদের সকলের সাথেই মনের চাহিদা এবং মনের প্রয়োজনীয়তা জড়িয়ে রয়েছ। এমন অবস্থায় যে ব্যক্তি-ই মনচাহি জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করে, সে এই বাস্তবতা থেকে যেন চোখ বন্ধ করে রাখে যে, তার সাথে তারই সমজাতীয় আরো অনেকেই রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা থেকে চোখ বন্ধ করে রাখলে বাস্তব বিষয়টি তো আর ভুল প্রমাণিত হয়ে যায় না। বাস্তবতা তার আপন জায়গাতেই টিকে থাকে। এ

কারণেই কিছু লোকের প্রবৃত্তি ও আত্মপূজার ফলাফল অবশ্যই অপরের জন্য দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে আসে।

প্রবৃত্তিপূজারী মনের রাজা

প্রবৃত্তিপূজার জীবন-যাপনকারী হয়ে থাকে মনের রাজা। মনের রাজা তো ঐ রাজা, গোটা জগত জুড়ে প্রবৃত্তির দৌরাত্ম চললেও যার মোটেও পেট ভরে না। সে তার চেয়েও আরো অধিক সম্পদের লোভ করে থাকে।

ভেবে দেখুন– যখন এই সমগ্র জগতও একজন মাত্র মনের রাজার আত্মায় প্রশান্তি আনতে যথেষ্ট হয়নি, তখন এক এক বাড়ীর সীমিত পৃথিবীতে যে একাধিক মনের রাজা বিদ্যমান, তারা কি করে প্রশান্তি ও স্বস্তি পেতে পারে। আত্ম ও প্রবৃত্তিপূজার এই ব্যাধি প্রতিটি বাড়ীতে চার-চারটি মনের রাজা তৈরী করেছে। বাপ মনের রাজা, মা মনের রাণী; ছেলেও রাজা, মেয়েও রাণী। এ অবস্থায় কিভাবে বাড়ী-ঘরগুলিতে শান্তি-স্বস্তি থাকতে পারে? এই প্রবৃত্তিপূজার জীবন– যাকে প্রত্যেকেই অর্জন করতে চায়– একটি অগ্নিকুন্ডে পরিণত হয়ে গেছে, যেখানে প্রতিটি বাড়ীর লোকজনও জ্বলছে, প্রতিটি রাষ্ট্রের নাগরিকরা পুড়ছে এবং পৃথিবীর গোটা মানব বসতি যে অগ্নিকুণ্ডে ঝলসে যাচ্ছে।

প্রবৃত্তিপূজার জীবন বিপদের উৎস

পৃথিবীর বিপদ ও সংকটের উৎস এটাই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ রিপু ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে চায়। এই বিপদ ও সংকটের সমাধান এটাই যে, মনের বক্তব্য গ্রহণ করার পরিবর্তে খোদার অনুসরণ করুন। কোটি মানুষ তো দূরের কথা, এই পৃথিবী মাত্র দু'জন মানুষেরও মনচাহি জীবন যাপনের অবকাশ নিজের মধ্যে ধারণ করে না। এ কারণেই মনচাহি জীবন যাপনের ইচ্ছা ত্যাগ করুন এবং সেই ধারার জীবন যাপনের চেষ্টা করুন, যার পয়গাম আল্লাহ্‌র পয়গাম্বরগণ দিয়ে গেছেন; অর্থাৎ খোদার দাসত্ব ও খোদাপ্রেমের জীবন। এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা প্রতি যুগে এই জীবনের আহবানকারী পয়গাম্বরগণকে পাঠিয়েছেন। কেননা এই জীবনধারা অবলম্বন করেই পৃথিবী চলতে পারে।

পয়গাম্বরগণ পূর্ণ সামর্থ ব্যয় করে এই জীবন ধারার দাওয়াত দিয়েছেন এবং প্রবৃত্তিপূজার তীব্রতা ভেঙে চূর্ণ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা-শক্তি ব্যয় করেছেন। কিন্তু যেমন শুরুতে আমি নিবেদন করেছি যে, তথাপি পৃথিবীতে আত্মপূজা ও

প্রবৃত্তিপূজার প্রচলন বন্ধ হয়নি। যখনই খোদার দাসত্বের আহবান শিথিল হয়েছে, তখনই প্রবৃত্তিপূজার প্রচলন বেড়ে গেছে। প্রবৃত্তিপূজার প্লাবন আসতে আসতেই পৃথিবীর সাধারণ লোকদের সমস্যা বেড়ে গেছে এবং অসহনীয় পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সময়কালটাকে দেখুন। এই শতাব্দীতে রিপু ও প্রবৃত্তিপূজার জীবনের প্রচলন শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলো। দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো এরই প্রভাব। এ ছিলো এক প্রবাহমান নদী, যার স্রোতে ছোট-বড় সবকিছু ভেসে যাচ্ছিলো। রাজা-বাদশাহ নিজ নিজ প্রবৃত্তির পূজায় লিপ্ত ছিলো, প্রজা-সাধারণও রাজা-বাদশাহদের অনুকরণে পরিণত হয়েছিলো প্রবৃত্তিপূজার শিকারে। উদাহরণ স্বরূপ ইরানের অবস্থা বর্ণনা করছি।

ইরানী জাতির প্রতিটি শ্রেণী প্রবৃত্তিপূজার ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলো। ইরানের বাদশাহর প্রবৃত্তিপূজার অবস্থা এমন ছিলো যে, তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিলো বার হাজার। যখন মুসলমানগণ সেই দেশটিকে এমন বিপদ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আক্রমণ চালালেন এবং ইরানের বাদশাহ পালিয়ে গেলো, সেই নাজুক মুহূর্তেও অবস্থা এমন ছিলো যে, বাদশাহর সাথে ছিলো এক হাজার বাবুর্চি, এক হাজার ছিলো তার স্তুতিবাক্য পাঠকারী এবং আরো এক হাজার ছিলো বাজ ও শিকারী পাখীর সংরক্ষক ও ব্যবস্থাপক। কিন্তু তারপরও বাদশাহর আক্ষেপ ছিলো যে, সাংঘাতিক সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় তাকে বের হয়ে যেতে হয়েছে। সেই যুগের জেনারেল ও সেনাপতিরা লক্ষ টাকার টুপি এবং লক্ষ টাকার মুকুট লাগাতো। উঁচু সোসাইটিতে মামুলি ধরনের পোষাক পরা ছিলো এক ধরনের অপরাধ। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রবৃত্তিপূজা সাধারণ জনগণকে কেমন দুর্ভোগে ফেলেছিলো, এ বিষয়টির অনুমান আপনি এই তথ্য থেকে করতে পারেন যে, কৃষকদের অবস্থা এমন করুণ হয়ে গিয়েছিলো যে, তারা কর দিতে পারতো না এবং ক্ষেত-খামার ত্যাগ করে খানকাহ আর ইবাতখানায় এসে আশ্রয় নিতো। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আমীর-উমারাদের প্রতিযোগিতার শিকারে পরিণত হয়ে দেউলিয়া হয়ে যেতো। ফলে অর্থনৈতিক নৈরাজ্য ছিলো সর্বপ্লাবী। মোটকথা জীবন সেখানে কী ছিলো? একটি রেসের ময়দান ছিলো। জুলুম ও সীমালংঘন ব্যাপক ছিলো। প্রত্যেক বড় তার ছোটকে এবং শাসক তার শাসিতকে লুণ্ঠন করা এবং তাদের রক্ত চোষার প্রচেষ্টায় লেগে ছিলো। গোটা সোসাইটিতে এক হতাশা ছড়িয়ে পড়েছিলো। আপনারা বুঝতে পারছেন– এমন সোসাইটিতে নৈতিকতা, বিশ্বাস ও চরিত্র কিভাবে গড়ে উঠতে পারে এবং আখেরাতের ভাবনা ও নৈতিক দায়িত্বের ভাবনা

কার থাকতে পারে? এই সমস্ত উন্নত বিষয়গুলিকে তো প্রবৃত্তিপূজার প্লাবনই ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু এমন কেউ ছিলো না যে, এই প্লাবনের মুখে বাঁধ রচনা করবে এবং স্রোতকে রুখে দাঁড়াবে। জ্ঞানী, সাহিত্যিক ও দার্শনিক-সকলেই এই স্রোতের দিকেই খড়-কুটোর মত ভেসে যাচ্ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই প্রবৃত্তিপূজার স্রোতকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন

কারো মাঝে সাহস ছিলো না, স্রোতের বিরুদ্ধে কদম ফেলে দেখাবে। স্রোতটি কিসের ছিলো? পানির স্রোত নয়, সাধারণ প্রচলনের স্রোত। সেই স্রোতের গতি ঘুরিয়ে দেওয়ার সাহস করতে পারে একমাত্র কোন সিংহ হৃদয় ব্যক্তি। আল্লাহর মঞ্জুর ছিলো- ঐ স্রোতের গতি ঘুরে যাবে। এই কাজের জন্য আল্লাহ্ তাআ'লা আরবে একজন মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে নবুওয়্যত দান করেছেন। যাঁকে আমরা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নামে স্মরণ করি। তিনি প্রচলিত স্রোতের বিরুদ্ধে শুধু কদমই রাখেননি। সেই স্রোতের গতিকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে ছিলেন। সেই সময় এমন কোন লোক দিয়ে কাজ হতো না, যে স্রোতের গতি পাল্টে দিতে না পারলেও সেই স্রোতে প্রবাহমান বস্তুকে উদ্ধার করতে পারে। কেননা, তখন এমন কোন সংরক্ষিত ও নিরাপদ জায়গা ছিলো না, যেখানে সেই স্রোতের প্রবাহ বইছে না। ইবাদতখানা এবং গীর্জাগুলিও এই প্লাবনের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিলো। এই সমুদ্রে কোথাও কোন আশ্রয়-দ্বীপ ছিলো না। আর থাকলেও তা প্রতি মুহূর্তে ছিলো খতরার মধ্যে। ঈমান, নৈতিক চরিত্র, ভদ্রতা, সংস্কৃতি এবং অল্প কথায় মানবতার প্রাণকে সেই প্লাবন থেকে বাঁচানোর কাজ যদি কেউ করতে সক্ষম হতেন, তাহলে কেবল সেই ব্যক্তি-ই সক্ষম হতেন, যার মাঝে স্রোতের গতি ঘুরিয়ে দেওয়ার সাহস রয়েছে। এমন ব্যক্তিত্ব তখন শুধুমাত্র আল্লাহ্র সেই আখেরী পয়গাম্বরের ছিলো, যিনি গণ রেওয়াজের ঐ স্রোতকে, যা এক ঝড়ের রূপে প্রবৃত্তিপূজার দিকে প্রবাহিত হচ্ছিলো- মাত্র কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় খোদার দাসত্বের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা যে বিস্ময়কর বিপ্লবের চিত্র এক নিশ্বাসে দেখতে পাই, যা সমস্ত জীবন এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র জগতকে প্রভাবিত করেছে এবং এখনও মানবতা ও খোদার দাসত্বের যতটুকু পুঁজি অবশিষ্ট রয়েছে, এর সবই সেই মহান পয়গাম্বরের শ্রম ও মেহনতের সুষমা মন্ডিত ফসল।

কবি বলেন–

দুনিয়ায় এখন যে বসন্ত পল্লবিত

তার সব চারা গাছ, তাঁরই লাগানো ছিলো।

অসম্ভব নয় যে, আপনাদের কারো এই সন্দেহ হতে পারে, এমন দাবী করা তো ঠিক নয় যে, সেই যুগে সাধারণভাবে মানুষ শুধু প্রবৃত্তিপূজারী ছিলো। কেননা অন্য কিছু কিছু বস্তুর পূজারীও সে যুগে ছিলো। কিছু লোক সূর্য পূজা করতো, কিছু লোক আগুন পূজা করতো, কিছু লোক ক্রুশের পূজা করতো, কিছু লোক গাছ পূজা করতো এবং কিছু লোক করতো পাথরের পূজা। এ বিষয়গুলি স্ব স্ব স্থানে সঠিক। কিন্তু এই সমস্ত পূজা সেই এক পূজারই বিভিন্ন প্রকার, যে পূজার গণপ্রচলনের কথা আমি দাবী করছি। এই সব পূজা এ কারণেই করা হতো যে, এগুলি প্রবৃত্তিপূজার পরিপন্থী ছিল না। এইসব পূজা পূজারীর মনচাহি জীবন যাপনে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো না। আগুন, মাটি, পাথর, সূর্য ইত্যাদি বস্তুগুলি তো পূজারীদের একথা বলতো না যে, তোমরা এই কাজ করো এবং এই কাজ থেকে বিরত থাকো। এজন্যই তারা এসব বস্তুর পূজার পাশাপাশি নিজের প্রবৃত্তির আনুগত্যও করতো। এ দুয়ের মাঝে তারা কোন সংঘাত দেখতো না।

মোটকথা আমাদের পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্রোতের সাথে লড়াই করার এবং এই স্রোতের গতিধারা পাল্টে দেওয়ার দায় নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করলেন। আর এভাবে গোটা সোসাইটির সাথে দ্বন্দ্ব কিনে নিলেন। অথচ তিনি তাঁর এই সোসাইটিতে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য এবং সকলের প্রিয়ভাজন ছিলেন। সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত– এই সম্মানজনক উপাধিতে তাঁকে ডাকা হতো। ব্যক্তিগত উন্নতি ও সম্মান লাভের বহু সুযোগ তাঁর ছিলো। তাঁর প্রতি তাঁর গোত্রের এতই নির্ভরতা ও আস্থা ছিলো যে, সম্মান ও উন্নতির এমন কোন উঁচু স্তর ছিলো না, যা তাঁর অর্জন হতো না। কিন্তু এসবই তখনই সম্ভব ছিলো, যখন তিনি তাদের জীবনের গতিকে ভুল না বলতেন এবং তাদের জীবনের গতিকে অন্য একদিকে প্রবাহিত করার ইচ্ছা ও সংকল্প ব্যক্ত না করতেন। কিন্তু তাঁকে তো আল্লাহ্ পাক দাঁড় করিয়েছেনই এজন্য যে, প্লাবনের স্রোতে নিজেও যেন ভেসে না যান এবং অন্য কাউকেও ভেসে যেতে না দেন। তাই সবার আগে তিনি নিজের জীবনকে খোদার দাসত্বমুখী জীবনের নমুনা বানিয়ে পেশ করেছেন। অন্য কথায় বলা যায়– স্রোতের বিরুদ্ধে নিজে কদম ফেলে দেখিয়েছেন, তারপর সম্পূর্ণ সোসাইটির গতি প্রবৃত্তিপূজা থেকে সরিয়ে খোদার দাসত্বের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু করেছেন।

খোদার দাসত্ব জন্মানোর মৌলিক তিনটি বিষয়

এই চেষ্টা সফল করার লক্ষ্যে তিনি মৌলিক তিনটি বিষয় মানুষের সামনে পেশ করলেন। এক. এই বিশ্বাস করো যে, তোমাদের এবং সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা আর এই জগতের উপর কর্তৃত্ববান সত্ত্বা এক। দুই. এই বিশ্বাস করো যে, এই জীবন শেষ হওয়ার পর অন্য একটি জীবন আছে। সেই জীবনে এই জীবনের হিসাব-নিকাশ হবে। তিন. এই বিশ্বাস করো যে, আমি আল্লাহ্র পাঠানো পয়গাম্বর। তিনি এই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। এই বিধি-বিধান মেনে আমাকেও চলতে হবে, তোমাদেরও চলতে হবে। তিনি যখন এইসব ঘোষণা করলেন, তখন সোসাইটিতে হৈ চৈ পড়ে গেলো। বিরুদ্ধবাদীরা উঠে দাঁড়ালো। তারা উঠে দাঁড়ালো এজন্য যে, এই শ্লোগান তাদের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী ছিলো। সারা জীবনকাল যেই দিকে প্রবাহিত হচ্ছিলো, তা ছেড়ে দিয়ে অন্যমুখী হওয়া; ফলত কোন সহজ কাজতো ছিলো না। জীবনের ডিঙ্গি স্রোতের তালে তালে বয়ে যাচ্ছিলো। কোন কষ্ট ছিলো না। তাদের কী আর দায় পড়েছে যে, স্রোতের বিপরীতে ডিঙ্গি চালিয়ে নানা দুর্ভোগ ও শংকা তারা কিনে আনবে! এজন্য তারা চেয়েছে, এই আওয়াজ যেন থেমে যায়। কিছু কিছু লোক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়তের উপরই সন্দেহ করে বসেছে। তাদের বুঝেই আসছিলো না, তাদের মতই দেখতে একজন মানুষ এমন প্রত্যয়ী কি করে হতে পারে যে, জীবনের এই ঝড়ো স্রোতের গতি সে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা ভেবেছে– এই স্রোতে তো শুধু আমরাই নই, গোটা দুনিয়ার সকল জাতি, সকল জাতির বিদ্বান ও প্রাজ্ঞ শ্রেণী, নেতা ও সাধু মহল-সবাই ভেসে চলেছে। এই স্রোতে ভেসে চলেছে শুকনা খড়কুটোর মত সকল জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সরদারেরা, জাতি সমূহের বিশ্বাস ও নীতি-আদর্শ, তাদের প্রজ্ঞা ও দর্শন, সাহিত্য ও রাজনীতি। তারা এই দাবী ও দাওয়াতের ব্যাপারে কাউকে আন্তরিক মনে করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলো। এ কারণে তারা ভেবেছে, 'এই ডালে জরুর 'কুছ কালা' রয়েছে। তারা ভেবেছে– হতে পারে এই অতি উচ্চ আহবানের পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য এবং অন্য কোন খায়েশ কাজ করছে। এজন্য তারা একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালো।

এই প্রতিনিধি দল তাদের নিজেদের ধ্যান–ধারণা অনুযায়ী তিনটি বড় জিনিস তাঁর সামনে উপস্থাপন করলো। তারা বললো– এ ধরনের কথাবার্তা দিয়ে

আপনার উদ্দেশ্য যদি এটা হয়ে থাকে যে, আমরা যেন আপনাকে নিজেদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে এই কথাবার্তা ত্যাগ করুন। আপনার নেতা হওয়ার ইচ্ছা আমরা মঞ্জুর করে নিলাম। অথবা যদি অনেক ধন-সম্পদের প্রত্যাশী আপনি হন, তাহলে তা-ও আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কিংবা আপনি যদি কোন সুন্দরী নারীর প্রতি আগ্রহী হন, তাহলে আমরা সেই ইচ্ছাও পূরণ করবো। আমরা দেশের সবচেয়ে সুন্দরী নারী আপনার সামনে পেশ করবো। আপনি যেসব নতুন কথা উঠাতে শুরু করেছেন, সে কথাগুলো শুধু বন্ধ করুন। কিন্তু আল্লাহ্‌র এই সাচ্চা রাসূল এবং খোদায়ী দাসত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এই পতাকাবাহী চূড়ান্ত অমুখাপেক্ষীতার সাথে উত্তর দিলেন– আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছু নিতে চাই না, আমি তো তোমাদের কিছু দিতে চাই। আমি যা দিতে চাই, সেগুলো হলো এই তিনটি কথা, যেগুলোর প্রতি আমি তোমাদের আহ্‌বান করছি। আমি চাই, মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তোমরা যেন শান্তি পাও। আর সেটা আমার এই তিন কথার উপর নির্ভরশীল। তাঁর কথাই শুধু নয়, তাঁর গোটা জীবনই সেই লোকদের এ ধারণাকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছে যে, তিনি পৃথিবীর কোন বস্তুর প্রতি আগ্রহী ছিলেন। শত্রুতা ও বিরোধিতা এমনই তীব্র রূপ ধারণ করেছিলো যে, তাঁকে মক্কা ছেড়ে মদীনায় যেতে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র দাসত্বের আহ্‌বান তিনি ছাড়েননি।

প্রবৃত্তিহীনতা ও খোদার দাসত্বঃ আশ্চর্য উদাহরণ

বিরুদ্ধবাদীদের কোন ধারণাই ছিলো না যে, প্রবৃত্তিপূজা থেকে তাঁর অবস্থান কত দূরে ছিলো এবং প্রবৃত্তিপূজার এই স্রোতের বিপরীতে সাতরে যাওয়ার কী পরিমাণ শক্তি ও দৃঢ়তা তাঁর মাঝে ছিলো। তিনি প্রবৃত্তিপূজা থেকে এতই দূরে ছিলেন যে, মক্কা ছেড়ে বাধ্য হয়ে চলে যাওয়ার কিছুদিন পার যখন আবারও মক্কায় বিজয়ী বেশে ফিলে এলেন, নিজের শত্রুদের পরাজিত করে এলেন, তখনও তাঁর খোদার দাসত্বমূলক চরিত-বৈশিষ্টের সামান্য পরিবর্তন ঘটেনি। বিজয়ের সামান্যতম পরিমাণ উন্মাদনাও তাঁর উপর চড়াও হতে পারেনি। বিজয়ী বেশে তাঁর মক্কা প্রবেশের ধরণটি ছিলো এমন যে, তিনি উটে সওয়ার হয়ে আসছিলেন, গায়ে ছিলো গরীব মানুষের পোষাক এবং মুখে ছিলো আল্লাহর শুক্র ও নিজের অক্ষমতা ও বিনয়ের প্রকাশ। এই অবস্থায় মক্কার এক লোক তাঁর সামনে পড়ে গেলো এবং ভয়ে কাঁদতে শুরু করলো। তিনি বললেন– ভয় পেয়ো না! আমি কুরাইশ গোত্রের সেই গরীব মহিলার ছেলে, যে শুকনা গোশ্‌ত খেত।'

ভেবে দেখুন– কোন বিজয়ী বীর এ ধরনের মুহূর্তে এমন কোন কথা বলতে পারে, যার ফলে লোকজনের মন থেকে তার প্রতি ভীতি উঠে যায়। এ ধরনের মুহূর্তে চেষ্টা করা হয়, যেন অধিক থেকে অধিকতর ভীতির সঞ্চার করা যায়।

আপনারা বর্তমানেও দেখতে পাচ্ছেন এবং অতীতের অবস্থাও ইতিহাসে পড়ে দেখতে পারেন, রাষ্ট্র ও ক্ষমতা যাদের হাতে এসে যায়, তাদের পরিবার-পরিজন তার দ্বারা কী পরিমাণ লাভবান হয়, কী পরিমাণ সুবিধা ভোগ করে এবং কত রকম আরাম-আয়েশ ও বিনোদন তাদের সামনে লুটিয়ে পড়ে; কিন্তু খোদার দাসত্বের এই ঝাণ্ডাবাহীর অবস্থা এক্ষেত্রেও প্রচলিত পৃথিবী থেকে ছিলো ভিন্ন। তাঁর আদরের কন্যা নিজের ঘরে সব কাজ নিজ হাতে করতেন; যার ফলে তাঁর হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিলো এবং শরীরে পানির মশক বহনের চিহ্ন পড়ে গিয়েছিলো। একদিন তিনি শুনতে পেলেন, যুদ্ধের ময়দান থেকে কিছু দাস-দাসী আব্বাজানের খেদমতে হাজির করা হয়েছে। তিনি ভাবলেন– আমিও এক-আধটা দাস অথবা দাসী চেয়ে নিয়ে আসবো। তিনি তাশরীফ নিয়ে গেলেন। নিজের দুর্ভোগের কথা ব্যক্ত করলেন। হাতে কড়া পড়ে যাওয়ার দাগ দেখালেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– আমি তোমাকে দাস-দাসীর চেয়েও উত্তম জিনিস দিচ্ছি। অন্য মুসলমানদের ভাগে দাস-দাসীকে যেতে দাও। ঘুমানোর সময় তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়ে নিও।'

প্রবৃত্তিহীনতা এবং খোদার দাসত্বের এ এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত, এ এক আশ্চর্য উদাহরণ।

নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন আল্লাহ্র উপাসনাকারী ও আল্লাহ্র দাসত্বকারীদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। এরপরও কি কেউ তাঁর প্রবৃত্তিহীনতার বিপক্ষে কোন প্রশ্নের অক্ষর ব্যয় করতে পারে! অপরের পক্ষে এই উদারতা ও বদান্যতাকে এবং নিজের ও নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রে এই নিঃস্বতা ও দারিদ্রকে প্রাধান্য দেওয়া মূলত পয়গাম্বরেরই বৈশিষ্ট।

বর্তমানে আপনাদের মাঝে এমন লোক আছেন, যারা অতীত দিনে কয়েকদিন অথবা কয়েক বছর জেল খেটেছেন। আজ ক্ষমতা লাভের পর সুদসহ সেই সব কষ্টের হিসাব উঠিয়ে নিচ্ছেন। যখন কোন ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা এবং আইনের শক্তি এসে যায়, তখন সে নিজের স্বজন ও সন্তানদেরকে আইনের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু খোদার দাসত্ববাদীদের মহান নেতার

অবস্থা এক্ষেত্রেও ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। এক মহিলার চুরির অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। তিনি হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। লোকজন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত ও প্রিয় সাহাবীকে দিয়ে সুপারিশ করিয়েছে যে, মহিলাকে ক্ষমা করে দেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে গেছে। তিনি বলেছেন– খোদার কসম! যদি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কন্যা ফাতেমার দ্বারাও এমন অপরাধ ঘটে যায়, তাহলে মুহাম্মদ (সাঃ) তার হাতও কেটে ফেলবে।"

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ হজ্ব পালনকালে মুসলমানদের বিশাল সমাবেশে কিছু আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের ঘোষণা করেন। তখন সবার আগে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও নিজের পরিবারের উপর সেইসব আইন-কানুন জারি করেন। তিনি আ'ম মজমার মধ্যে ঘোষণা করেন– আজ থেকে জাহেলিয়াতের সকল রীতি-নীতি বিলুপ্ত করা হলো। সুদী লেন-দেন আজ থেকে বন্ধ এবং সবার আগে আমি আমার চাচা আব্বাস (রা.)এর সুদী ঋণকে বাতিল ঘোষণা করছি। এখন থেকে তার সুদ কারো উপর আবশ্যকীয় নয়। তিনি আর সুদের পয়সা কারো নিকট থেকে উসূল করতে পারবেন না।

এটাই ছিলো খোদার দাসত্ব। পক্ষান্তরে আজকের আইনপ্রণেতাগণ যদি এ ধরনের কোন আইন তৈরীর জন্য প্রস্তুত হতেন, তাহলে আগেই নিজের আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত নিকটজনকে জানিয়ে দিতেন যে, অমুক আইন আসছে। তাড়াতাড়ি নিজের ভাবনাটা ভেবে নাও। জমিদারী বিলুপ্ত করার আইন পাশ হতে যাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি যমীন ছুটাতে পার, ছুটিয়ে নাও। বেচতে চাইলে বেচে দাও। এমনই মুহূর্তে তিনি ঘোষণা করেছেন– ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াত যুগের সকল রক্তের দাবী বাতিল করা হলো। এখন আর সেই সময়ের কোন খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না। এই আইনের অধীনে আমি সবার আগে রবীআ' ইবনে হারেসের (আমার বংশের রক্তের দাবী) রক্তের দাবী বাতিল ঘোষণা করছি।

আমাদের নবী (সা.) উপমাহীন এই খোদার দাসত্ব নিয়ে– যার কয়েকটি মাত্র উদাহরণ আমি দিয়েছি– প্রবৃত্তিপূজার প্লাবনের সাথে লড়াই করেছিলেন। তাঁর লড়াই ছিলো সেই প্লাবনের বিরুদ্ধে, যে প্লাবন সকল জাতিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে তিনি সেই প্লাবনকে রুখে দাঁড়াতে সমর্থ হন। লোকজন বাধ্য হয়ে তাঁর কথায় কান পাতে এবং তাঁর পয়গাম মেনে নেয়।

বিস্ময়কর বিপ্লব

এভাবে যেসব ব্যক্তি নবীজীর এই তিনটি মৌলিক বিষয়কে যথার্থভাবে গ্রহণ করে নিয়েছে– যা খোদার দাসত্বমুখী জীবনের মূল ভিত্তি– সেসব লক্ষ-কোটি মানুষের জীবনের গতি এমনভাবেই বদলে গেছে যে, বর্তমান পৃথিবীতে বিশ্বাস করাই দুরূহ হয়ে পড়ে, এমনও মানুষ হতে পারে! আমি উদাহরণ স্বরূপ তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনের আলোচনা করবো।

নবীজীর দাওয়াত গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজন ছিলেন হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রা.), যিনি নবীজী (সা.)-এর ওফাতের পর তাঁর প্রথম স্থলাভিষিক্ত এবং ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল হয়েছিলেন। এই হযরত আবু বকরের প্রবৃত্তিহীনতার অবস্থা এমন ছিলো যে, তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সবচেয়ে উঁচু পদের অধিকারী হলেও জীবন এমনভাবে কাটাতেন যে, তার ফলে তার পরিবারের লোকেরা মিষ্টি মুখ করতেও দ্বিধান্বিত হতেন। একদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন– বাচ্চারা কিছু মিষ্টি খেতে চায়।' তিনি উত্তরে বললেন– রাষ্ট্রীয় কোষাগার তো আমাদের মুখ মিষ্টি করার দায়িত্ব বহন করে না। কিন্তু ভাতা হিসাবে সেখান থেকে যা কিছু আমরা পাই, যদি তা থেকে কিছু বাঁচাতে পার, বাঁচিয়ে নাও এবং কোন মিষ্টি জিনিস রান্না করো।' স্বামীর কথামতো হযরত আবু বকর (রা.)-এর স্ত্রী প্রতিদিনকার খরচ থেকে অল্প অল্প পয়সা জমিয়ে একদিন হযরত আবু বকর (রা.)–এর হাতে তুলে দিলেন, যেন তিনি মিষ্টি রান্না করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে এনে দেন। তিনি সেই পয়সা নিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বশীলের কাছে চলে গেলেন এবং সেই পয়সা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দিয়ে দিলেন এবং বললেন– এগুলো রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভাতা হিসাবে আমি যা পাই, তা থেকেই বাঁচানো পয়সা। এতে বুঝা যায়– আমাদের প্রয়োজন এই পরিমাণ অর্থ ছাড়াও মিটে যায়, তাই এখন থেকে এই পরিমাণ অর্থ কমিয়ে আমার ভাতা দিবেন।'

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা.)-এর খেলাফতের যুগে যখন মুসলমানগণ বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করলেন এবং হযরত উমর (রা.) সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গীরূপে একজন গোলাম ছিলো। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় এই শাসকের কাছে সওয়ারী ছিলো শুধু একটি। সেই সওয়ারীতে কিছু পথ তিনি সওয়ার হয়ে যেতেন এবং কিছু পথ গোলামকে সওয়ার বানিয়ে তিনি পায়ে হেঁটে চলতেন। যে সময় তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে

প্রবেশ করছিলেন, সে সময় গোলাম সওয়ারীর উপর ছিলো এবং তিনি পায়ে হেঁটে চলছিলেন। তাঁর পরিহিত কাপড়ে ছিলো অনেক জোড়া-তালি। তাঁর যুগেই একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিলো। তখন তিনি নিজের জন্য সেই খাবার খাওয়া জায়েয মনে করতেন না, দুর্ভিক্ষের কারণে প্রজা-সাধারণের পক্ষে যা সহজলভ্য ছিলো না।

হযরত খালেদ (রা.)– যিনি মুসলমান সেনা বাহিনীর কমান্ডার ইনচীফ ছিলেন এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্মান সূচক খেতাব দিয়েছিলেন– 'সাইফুল্লাহ' বা 'আল্লাহর তরবারী'– তিনি এমনই প্রবৃত্তিমুক্ত ছিলেন এবং প্রবৃত্তিপূজা থেকে এ পরিমাণ স্বাধীন ছিলেন যে, একবার তাঁর একটি ত্রুটির কারণে একদম রণাঙ্গনে তাঁর কাছে তৎকালীন খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে তাঁর অপসারণের চিঠি পৌঁছলে তাঁর কপালে সামান্য ভাঁজও পড়লো না। বরং তিনি বললেন– যদি আমি এ মুহূর্ত পর্যন্ত উমর (রা.)–এর সন্তুষ্টি অর্জন কিংবা আমার সুনাম বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে থাকি, তাহলে এখন আর যুদ্ধ করতাম না। কিন্তু যেহেতু আমি আল্লাহ্‌র জন্য যুদ্ধ করে থাকি, তাই সেনাপতির পরিবর্তে একজন মামুলি সিপাহীর ভূমিকা নিয়েই আমি যথারীতি যুদ্ধ করে যাবো।' পক্ষান্তরে এর বিপরীতে এ যুগের একটি তাজা দৃষ্টান্ত হলো– জেনারেল মেক আর্থার। কোরিয়ায় যুদ্ধে লিপ্ত সৈন্যদের সেনাপতির পদ থেকে তাকে প্রেসিডেন্ট ট্রুমেন অপসারণ করার পর সে ভীষণ ক্ষুব্ধ হলো এবং ট্রুমেনের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে গেলো।

খোদার দাসত্বমুখী সোসাইটি

এই কয়েকজন মানুষই শুধু নয়, বরং তিনি পুরো জাতি ও সোসাইটিকে এই নীতির ভিত্তিতেই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সেটি খোদার দাসত্বের পরিচায়ক একটি সোসাইটিতে পরিণত হয়ে যায়। তাঁর নীতি ছিলো এই যে, যদি কেউ কোন পদমর্যাদার প্রার্থী বা আগ্রহী হতো, তিনি তাকে পদমর্যাদা দিতেন না। পক্ষান্তরে এমন সোসাইটিতে পদমর্যাদার প্রার্থী সাজা নিজের গুণ-গান বর্ণনা করা এবং ক্ষমতার জন্যে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোন অবকাশই ছিলো না। যেই মানব গোষ্ঠীর সামনে প্রতি মুহূর্তে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত জীবন্ত থাকে, তাদেরকে কি ঠুনকো অহংবোধ ও কোন ধরনের বিপর্যয় ভাবনা স্পর্শ করতে পারে?

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين

[সেই আখেরাতের আবাস আমি এমন লোকদের জন্যই নির্ধারিত করে দেবো, যারা পৃথিবীতে কোন উঁচুতা চায় না এবং বিপর্যয় ছড়িয়ে দিতে চায় না। আর শেষ পরিণতি আল্লাহভীরুদের জন্য।]

এই আয়াতকে সামনে নিয়ে কোন ফেৎনা-ফাসাদ ও দ্বন্দ্বের অপরাধে অপরাধী হওয়া কি তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো?

এটিই ছিলো আল্লাহর দাসত্বের আহবান, যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিলেন এবং পরিণতির দিক থেকে এটিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর প্রয়াস হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি পৃথিবীর অন্য কোন দাওয়াত ও মিশনের নাম ধরে এ কথা বলতে পারবে না যে, তা পৃথিবীকে এ পরিমাণ কল্যাণ উপহার দিয়েছে। অথচ এই দাওয়াত ও মিশনের পক্ষে মানুষের এ পরিমাণ প্রচেষ্টা ও এ পরিমাণ উপায়-উপকরণের প্রয়োগ হয়নি, যে পরিমাণ প্রয়োগ ঘটছে আধুনিক যুগের কোন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের পক্ষে। কিন্তু তারপরও এই সকল বিপ্লব ও আন্দোলনের সম্মিলিত উপকারও সেই একটি মাত্র দা'ওয়াতের উপকার ও কল্যাণের এক দশমাংশও হতে পারবে না। এই পৃথিবী সেই দা'ওয়াতকে গ্রহণ করে নিলে আজও দুনিয়া থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল অবিচার এবং নৈতিক ত্রুটি বিদায় নেবে।

কিন্তু অন্যদের সম্পর্কে কি বলবো, যখন স্বয়ং এই মিশনের ঝাণ্ডাবাহীরাই বর্তমানে প্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে গেছে। প্রবৃত্তিপূজাতো আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে চুপ করে বসে ছিলো। সুযোগ পেয়েই সে খোদার দাসত্বের ঝাণ্ডাবাহীদের উপর এক চোট প্রতিশোধ আদায় করে নিয়েছে। যে মুসলমানগণ প্রবৃত্তিপূজাকে পরাজিত করে দিয়েছিলো এবং যাদের বিশেষত্ব ছিলো কুরআন মজীদের এই ঘোষণা–

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهو عن المنكر

[তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির জন্য তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে কল্যাণের আদেশ দিবে এবং অকল্যাণ থেকে বিরত রাখবে।]

আফসোস! তারাই এখন প্রবৃত্তিপূজার অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে।

পৃথিবীর সেরা দুর্ভোগ প্রবৃত্তিপূজা

আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্ভোগ হলো, প্রবৃত্তি পূজা। পৃথিবীর বড় বড় লিডার এবং শান্তির পতাকাবাহী [ট্রুমেন, চার্চিল, স্ট্যালিন] সবচেয়ে বড় প্রবৃত্তিপূজারী। এরা নিজেদের প্রবৃত্তিপূজার মধ্য দিয়ে এবং জাতীয় অহংবোধের মধ্য দিয়ে– যা প্রবৃত্তি পূজারই উন্নত ও বিকশিত রূপ– পৃথিবীকে ছাই বানিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত। এটম বোমার চেয়েও বিপজ্জনক ও ভয়ংকর হলো প্রবৃত্তিপূজা, যা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিয়েছে। লোকজন ক্রুদ্ধ হয় এটমবোমার উপর। তারা বলে থাকে– এটম বোমা কেয়ামত ঘটিয়ে দিতে পারে।' আমি তো বলি– এটমবোমার অপরাধ কি? আসল অপরাধীতো এটমবোমার নির্মাতা। তার চেয়ে আগে অপরাধী হলো, সেই সব বিদ্যায়তন এবং সেই সব সংস্কৃতি, যেগুলো এই বোমাকে অস্তিত্বে এনেছে। আর এসব কিছুরই মূল হলো প্রবৃত্তিপূজা, যা এই সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে।

আমাদের দা'ওয়াত

আমাদের দা'ওয়াত এবং আমাদের আন্দোলন শুধু এটাই এবং এই লক্ষ্যেই যে, প্রবৃত্তিপূজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক। খোদার দাসত্বমুখী জীবনধারা ব্যাপক করা হোক। আমরা এই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আপনাদের মুখোমুখি হয়েছি। আমরা জাতির প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে আহবান করি এবং তাদের সামনে আল্লাহ্র দাসত্বের শ্রেষ্ঠতম ঝান্ডাবাহী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা, তাঁর জীবনচরিত এবং তাঁর সাথীবর্গের ঘটনাবলী উপস্থাপন করি, যারা ছিলেন আল্লাহ্র দাসত্বের পথের সঠিক ও সত্য পথপ্রদর্শক। আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, তাঁদের দেখানো পথেই রয়েছে মানবতার মুক্তি এবং পৃথিবীর যাবতীয় দুর্ভোগের সমাধান। আমাদের কাজ ও বক্তব্য একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ; যার ইচ্ছা হয়, তিনি এই গ্রন্থ পাঠ করে দেখুন।